অধ্যায় - ২

স্থাপত্যশিল্প ও পাথর শিল্প

বাংলার সমাজ পটভূমি:

মধ্যযুগে স্থাপত্য শিল্পকলা উচ্চতম স্থান লাভ করেছিল। বাংলাদেশের বেশিরভাগ ঘর বাঁশের খুঁটি ও খড়ের চাল দিয়ে তৈরি করা হত। শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর "বাংলাদেশের ইতিহাসঃমধ্যযুগ (দ্বিতীয় খণ্ড)" গ্রন্থে লিখেছেন—"দেয়ালের গঠনে অংশ বিশেষ সম্মুখে বাড়াইয়া এবং পশ্চাতে হঠাইয়া বৈচিত্র্য সৃষ্টি, ইহার গায়ে নানা রকমের নক্সা, [.....] নানারূপ লতাপাতা ও জ্যামিতিক নক্সা খোদাই করা হইত। বাহিরের ও ভিতরের দেওয়ালে এইগুলির ব্যবহারের দ্বারা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করাই ছিল সাধারণ বিধি"।[১]

কবিকঙ্কণের কাব্যে হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যাচ্ছে। স্থাপত্য শিল্প কলার মধ্যে গৃহস্থের পারিবারিক এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনে নির্মিত বাসগৃহ, পুষ্করিণী, প্রাচীর, পায়রাশাল এবং হিন্দুর মন্দির ও মুসলমানদের নমাজ স্থানকে বোঝায়। এছাড়া নানা বৃত্তিজীবী মানুষের শিল্প সৃষ্টির উৎস-স্থাপত্যও এর মধ্যে পড়ে। আখেটিক খণ্ড এবং বণিক খণ্ড এই উভয় খণ্ডেই কবিকঙ্কণ স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় রেখে গেছেন।

মধ্যযুগের হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম হল মন্দির। শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর "বাংলাদেশের ইতিহাসঃমধ্যযুগ (দ্বিতীয় খণ্ড)" গ্রন্থে লিখেছেন—"মধ্যযুগের বাংলার অন্যান্য মন্দিরগুলি যে নূতন স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত তাহার বিশেষত্ব এই যে ইহা দেশের চিরপরিচিত কুটির বা কুঁড়ে ঘরের—অর্থাৎ দোচালা ও চৌচালা খড়ের ঘরের গঠন প্রণালী অনুসরণ করিয়া নির্মিত হইয়াছে"। [২]

হিন্দু মন্দিরগুলি দোচালা, জোড় বাংলা (পাশাপাশি দুটি দোচালা), চৌচালা, ডবল চৌচালা এবং রত্ন মন্দির প্রভৃতিতে বিভক্ত ছিল। কোন কোন মন্দির বিশেষ ভাস্কর্য সমন্বিত ছিল। অনেক মন্দিরে উৎকষ্ট শিল্প নিদর্শন পাওয়া যায়। মন্দিরের ভাস্কর্যে নানা নকশা, ফুল, লতা, পাতা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যের সমাহার বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।

সব মিলে মন্দির – মন্দির অভ্যন্তরের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং বহিঃস্থ পরিবেশের মাধুর্য অপূর্ব সৌন্দর্যের দ্যোতক ছিল। মন্দিরের দেওয়াল চিত্রগুলি থেকে সেকালের সামাজিক জীবনযাত্রা, আচার, রীতি-নীতি, পোশাক-আশাক, অলংকার, লোকযান, দেববাদ, পৌরাণিক কাহিনী, পশুপাখি ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের সুস্পষ্ট রূপরেখা লাভ করা যায়। বিনয় ঘোষ তাঁর "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (প্রথম খণ্ড)" গ্রন্থে লিখেছেন—

"দেবালয় স্থাপত্যের বিকাশ হয়েছিল বিশেষ একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশে। রাঢ়ের সূত্রধর ও গৃহশিল্পীরাই মনে হয় দো-চালা চারচালা আটচালা ধরনের ইঁটের বাংলা মন্দিরের রূপ দিয়েছিলেন। বাঁকা চাল খড়ের মাটির ঘরের প্রায় হুবহু অনুকরণে বাংলা মন্দির গড়ে উঠেছে"। [৩]

কিন্তু বাংলাদেশের স্থাপত্যশিল্প বিপন্ন, প্রায় হারিয়ে যাওয়ার পথে। বিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (প্রথম খণ্ড)' গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন—

"দেবালয় গড়তে পারেন, এরকম সুদক্ষ সূত্রধর শিল্পী এখন পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দুর্লভ বলা চলে। চিত্রকর পটুয়াদের মতন, তাঁরা জীবিকার জন্য ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করেছেন"। [৪]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে স্থাপত্য শিল্পের নানা বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। সেকালের বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পকলার রূপ ফুটে উঠেছে কবিকঙ্কণের কাব্যে। তবে নিম্নবর্গীয় ব্রাত্য মানুষের একান্তই ছোট-খাট খড়ের ছাউনি বা তালপাতার ছাউনি ঘরের পরিচয় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রায় নেই। আখেটিক খণ্ডে অনার্য শিল্পের পরিচয় থাকলেও কালকেতুর পুরী মঙ্গল দেবী চণ্ডীর উদ্দেশ্যে নির্মিত। আর বণিক খণ্ড অভিজাত বণিকদের স্থাপত্য শিল্পের চিহ্ন বহন করেছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল— আখেটিক খণ্ডে গুজরাট নগরীর পরিকল্পনা। এছাড়া কালকেতুর পুরী নির্মাণ এবং গৃহনির্মাণ কৌশল স্থাপত্য শিল্পের উচ্চতম সীমা স্পর্শ করেছে। শ্রীস্বদেশরঞ্জন চক্রবর্তী তাঁর "প্রাচীন বাংলা কাব্যে শিল্প প্রসঙ্গ" প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন—"তাহারা (বাঙ্গালীরা) গৃহে শান্ত শীতল ছায়ায় বসিয়া নানবিধ শিল্পবিদ্যার অনুশীলন করিয়া জাতীয় সংস্কৃতিকে পরিবর্ধনশীল করিয়া তুলিয়াছিল। তাই প্রাচীন বাংলার শিল্পীগণ, কী নগর পত্তন, কী সেতু বন্ধন, কী জাহাজ গঠন, সর্ববিষয়ে সুনিপুণ ছিল"। [৫]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত স্থাপত্য শিল্প :

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত বাস্তুশিল্প সমস্ত মধ্যযুগের স্থাপত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র নির্মাণ করেছে। গুজরাট নগর পরিকল্পনা এর মধ্যে প্রধান। জঙ্গল কেটে নগর তৈরি করে প্রজাবসতি গড়েছেন কালকেতু। বিভিন্ন বৃত্তিজীবী সম্প্রদায় বসতি স্থাপন করেছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খণ্ড এবং বণিক খণ্ডে উল্লিখিত স্থাপত্য শিল্পের পূর্ণাঙ্গরূপ নিম্নলিখিত ভাবে তুলে ধরা হচ্ছে -

পুরী/শিবের মণ্ডপ: আখেটিক খণ্ড-এ কালকেতু পুরী নির্মাণ করেছেন। সেই পুরীর দৈর্ঘ্য এক ক্রোশ। পুরীর প্রাচীর দীর্ঘ তালগাছের মত। পাথর দিয়ে ঘেরা সে পুরী। সে ঘর ছাওয়া হয়েছিল খড়ে। পুরীর ভেতরে ছিল চতুঃশালা। পুরীর মাঝে আটচালা। ভেতরে দিঘি। সেই খনন করা দিঘির ঘাট পাষাণ দিয়ে বাঁধানো। খিড়কির উত্তর দিকে ছিল সিংহ দরজা। পূর্বদিকে রন্ধনশালা। সাতান্ন 'রম্ভে' (বন্দর) ঘর ছিল পুরীতে। পুরী মজবুত করা হয়েছিল ইন্দ্রনীল পাষাণ দিয়ে। আর ছিল 'সপ্তমহল' বা সাত মহলা। ছিল চণ্ডীমণ্ডপ (চণ্ডীকার দেউল)। যা বাঙালির নিজস্ব ধর্ম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে মানানসই।

পুরীতে নানা প্রকারের আলপনা ও চিত্র প্রতিলিপি খচিত ছিল। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"এমন পাঁচির দিল হইল চারি পাট

বাছিআ পাথর দিল বীর ঝানকাট।

তাল সম উভ বীর করিল পাঁচির

.....

চারি হালা খড়ে বিশাই ছাইল চারি পাট।

পুরীর ভিতরে রচে চারি চতুঃশালা

মাজ্যা পিড়া খোপনা বান্ধে দিআ শিলা।

অন্তঃপুরে সরোবর করিল নির্মাণ

পাষাণে বান্ধিল তার ঘাট চারিখান।

উত্তরে খড়কি সিংহদ্বার পূর্বদেশে

পাষাণে রচিত ঘাট সান চারিপাশে।

সাতানৈআ রম্ভে বিসাই ধরে সুতা

ইন্দ্রনীল পাষাণে রচিত কৈল পোতা।

সপ্ত মহলে তোলে চণ্ডীকার দেউল

নানা চিত্র লিখে বিশাই হইআ অনুকূল।

নানা রত্ন দিআ তথি রচিল পিণ্ডিকা"। [৬]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিবের মণ্ডপের উল্লেখ আছে। শিব বাংলাদেশের প্রধান দেবতা। গুজরাট নগরীতে আছে শিবের মন্দির—"শিবের মণ্ডপে কৈল অজিন আসন"।[৭]

দেবগৃহকে 'মঠ' বলেও বলা হয়। হিন্দুদের বিশ্বাস, দেবগৃহ নির্মাণ এবং প্রতিষ্ঠা করলে মানুষ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। দেবগৃহ প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমিদান করলেও একই ফল ফলে। সাধারণত সোনা, রূপা, তামা, কাঁসা, পাথর দিয়ে দেব বিগ্রহ নির্মিত হয়।

আর গুজরাটে পুরীর বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন—

'সুধাময় দেখি পুরী নেতের পতাকা

রাকাপতি বেড়ি জেন ফিরয়ে বলাকা'। [৮]

দেবতাদের মধ্যে শিব মূর্তি প্রতিষ্ঠা সবচেয়ে সৎকর্ম এবং পুণ্যকাজ বলে মনে করেন ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা। বিশ্বাস, মন্দির নির্মাণ করে শিব প্রতিষ্ঠা করলে দেবতারা শিবলোক প্রাপ্ত হয়। 'অথ হিন্দু ব্যবস্থা সর্ব্বস্ব সমগ্র' গ্রন্থে বলা হয়েছে, দেবগৃহ নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করে পূজা করলে মানুষ দেবলোক লাভ করে।

"কৃত্বা দেবগৃহং সর্ব্বংপ্রতিষ্ঠাপ্য চ দেবতাম্

বিধায় বিধিবৎ পূজাং তল্লোকং বিন্দতে ধ্রুবম"। [৯]

বাংলার চণ্ডীমণ্ডপ, পুরী, মন্দির ছিল বাংলার স্থাপত্য শিল্পকৃতির অন্যতম নিদর্শন। স্থাপত্য শিল্পীদের মহত্তম প্রতিভার নিদর্শন থেকে গেছে দেবদেবীর জন্য নির্মিত মণ্ডপ এবং পুরীতে।

মহাভারতে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের কারণে যে গৃহ নির্মাণ করেছিলেন, সেখানে শিল্প-সৌন্দর্যের গৌরব ঈর্ষণীয় ছিল। বাসভবনগুলি কৈলাস পর্বতের শৃঙ্গের মত সুউচ্চ, সুন্দর, অলংকৃত ও সুনির্মিত ছিল। মহাভারতকার লিখেছেন—

"সৎকৃতাশ্চ যথোদ্দিষ্টান্ জগ্মুরাবসঘান নৃপাঃ।

কৈলাসশিখর প্রখ্যান্ মনোজ্ঞান দিব্যভূষিতান"।। [১০]

মধ্যযুগের বাংলার চণ্ডীমণ্ডপ বাঙালির পল্লী সংস্কৃতির প্রতীকরূপ। সমাজ সংহতির শিল্পমূর্তি। বিনয় ঘোষ তাঁর 'বাংলার লোক সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব' গ্রন্থের 'বাংলার চণ্ডীমণ্ডপ' প্রবন্ধে লিখেছেন—"বাংলার চণ্ডীমণ্ডপ বাঙালী জীবনের একটা ঐতিহাসিক চিহ্ন হিসেবে বাংলাদেশ থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। চন্ডীমণ্ডপের সঙ্গে একটা যুগের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির অন্যতম স্মৃতিচিহ্নও একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে। [.....] কেবল সংস্কৃতি অনুষ্ঠান বা ধর্মানুষ্ঠানের সাধারণ গৃহ চণ্ডীমণ্ডপ নয়। উৎসব পার্বণের মিলনমন্দির। [.....] চণ্ডীমণ্ডপ হল গ্রামের সর্বসাধারণের আলোচনাসভা মজলিশ ও আড্ডার ঘর, অতিথিশালা, বিচারালয় এমনকি গুরুমহাশয়ের পাঠশালা পর্যন্ত। [.....] কিন্তু চন্ডীমণ্ডপের 'স্মৃতি' ছাড়া আর কিছু থাকবে বলে মনে হয় না। এইজন্য দুঃখ হয়। [.....] গ্রাম্যসমাজ ভেঙে দিয়ে আমরা বাংলার চণ্ডীমণ্ডপ ধ্বংস করেছি"। [১১]

প্রাচীর : প্রাচীর বাংলাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যকলা। সাধারণত ঘরের চারপাশে বা মন্দিরের চারপাশে প্রাচীর তৈরি করা হয়। এছাড়া বসতবাড়ি, বাগান বা পুকুরকে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। বাসভূমি বা দেবালয়ের পরিকল্পনায় তিনটি আপ্তবাক্য (যথা—সত্যম অর্থাৎ স্থায়িত্ব, শিবম অর্থাৎ সমাজের মঙ্গলময় রূপ-মানসিক, দৈহিক এবং

নৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, সুন্দরম অর্থাৎ সুশোভন) কে বাঙালিরা প্রাচীনকাল থেকে গ্রহণ করে এসেছেন। স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম নিদর্শন প্রাচীর। বাড়ী, পুকুর, বাগানের সমাবেশকে সুন্দরের সামঞ্জস্যে বিন্যস্ত করে প্রাচীর। এছাড়া নিরাপত্তার প্রয়োজনে প্রাচীর দেওয়া হয়। সর্বোপরি প্রাচীরকে অলংকরণ করে সৌন্দর্য মণ্ডিত করেন বাঙালি রমণী। 'বাংলার মেয়েদের আলপনা ও প্রাচীর চিত্র' প্রবন্ধে গুরুসদয় দত্ত লিখেছেন – " মেয়েদের আলিম্পনা আঁকিবার কি অবলীলাময় ও স্বভাবসিদ্ধ কৌশল। কোথাও ভুল ত্রুটি নাই"।[১২]

কবিকঙ্কণের কাব্যের 'আখেটিক খণ্ডে' কালকেতু দেবী চণ্ডীর জন্য দেবালয়ের চারধারে প্রাচীর নির্মাণ করেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

'এমন পাঁচির দিল হইল চারি পাট'।

বাছিআ পাথর দিল বীর ঝানকাট।

তালসম উভ বীর করিল পাঁচির'।

পাথরের দান্ত্যা দিল হনুমান মহাবীর।। [১৩]

প্রাচীরের দেওয়ালে নানা আলপনা অঙ্কন করা হয়। মধ্যযুগ থেকেই পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে মন্দিরে কিংবা গেরস্থের বাস্তু পরিকল্পনার জন্য নির্মিত প্রাচীরে নানা দেওয়াল চিত্র এবং আলপনা অঙ্কন করার রীতি প্রচলিত ছিল। গুরুসদয় দত্ত 'বাংলার মেয়েদের আলপনা ও প্রাচীর চিত্র' প্রবন্ধে লিখেছেন—"পশ্চিমবঙ্গের পল্লীগ্রামে মাটির প্রাচীরে তুলিকার সাহায্যে যে নানাবর্ণের পদ্ম ও অন্যান্য প্রাচীরচিত্র আঁকিবার প্রথা এখনও বর্তমান আছে, তাহা বড়ই মনোমুগ্ধকর ও উঁচুদরের শিল্প কুশলতার, রসানুভূতির ও রসাভিব্যক্তির পরিচায়ক। [.....] কুটিরের মাটির দেওয়ালে উজ্জ্বল নীল, হলদে, সাদা ও সবুজ রঙে আঁকা দুটি পদ্মফুল—এই দুইটি পদ্ম রেখা ও রঙের অসাধারণ সৌন্দর্যের সমাবেশের সম্পদে কুটীরটিকে এমনই একটি গৌরবময় রূপ দিয়েছিল যে কুটীরটিকে লক্ষ করে না থাকা অসম্ভব ছিল"। [১৪]

ম্যালেরিয়া পীড়িত মধ্যযুগের বাংলা। দারিদ্র্য জর্জর এই বাংলাদেশে দেওয়াল চিত্রের স্রষ্টারা হলেন ব্রাত্য নীচ জাতীয় রমণী কিংবা দরিদ্র পল্লী শিল্পী। এই পল্লী

শিল্পীরা অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী। এই পল্লী শিল্পীদের বেশীরভাগই রমণী। গুরুসদয় দত্ত তাঁর 'বাংলার মেয়েদের আলপনা ও প্রাচীরচিত্র' প্রবন্ধে লিখেছেন—

"বাইরে আঁকা অপূর্ব সৌন্দর্যজ্ঞান ও সৌন্দর্যের অভিব্যক্তির প্রেরণা যে এই নীচজাতীয় দীনদুঃখী বিধবা রমণীর থাকতে পারে, তা সহজে কল্পনা করা যায় না। [.....] গ্রামের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ডাইনে বাঁয়ে যেদিকে চাওয়া যায় সেদিকেই প্রত্যেক বাড়ির দেওয়ালে অনুপম সৌন্দর্যময় রঙিন রূপাবলি নজরে পড়ে। [.....] সবই গ্রামের মেয়েদের হাতের কাজ [.....] প্রত্যেক চিত্রেই কেমন একটা অনির্বচনীয় সরলতা ও মাধুর্য যেন মাখা রয়েছে"। [১৫]

মহাভারতে রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠির অতিথি আপ্যায়নের জন্য যে সমস্ত বাসগৃহ নির্মাণ করেছেন, সেগুলি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রাচীরের রঙ সাদা, সেগুলি সোনার ঝালর এবং মণিময় বেদি দ্বারা শোভিত। মহাভারতকার লিখেছেন—

"সর্ব্বতঃ সংবৃতানুচ্চৈঃ প্রাকারৈঃ সিকৃতৈঃ সিতৈঃ।

সুবর্ণজালসংবীতান্ মণিকুট্টিমশোভিতান্"।। ২৩।। [১৬]

গুজরাট নগরীর পরিকল্পনা:

সেকালের নগর পরিকল্পনার চিত্র কবিকঙ্কণের কাব্যে ধরা পরেছে। নগর পরিকল্পনার সঙ্গে স্থাপত্যকলা বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। কালকেতু জঙ্গল কেটে গুজরাটে নগর পত্তন করেছেন। কলিঙ্গরাজের কাছে গুজরাট নগরের বর্ণনা দিয়েছেন। হিন্দু শাস্ত্রে স্থাপত্য শিল্পকলার শুরুতে কিছু শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে চলা হয়। গৃহারম্ভের সময়ে পূর্ব দিকে মস্তক রেখে শয়ন করা হয়। মনে করা হয়, বামদিকে নাগেরা শয়ন করে। এ জন্য নাগক্রোড়ে গৃহ প্রস্তুত প্রশস্ত বলে শাস্ত্র নির্দেশ মেনে চলতে হয়। 'অথ হিন্দু ব্যবস্থাসর্ব্বস্ব সমগ্র' গ্রন্থে বলা হয়েছে –

"পূর্বাদিষু শিরঃ কৃত্বা নাগঃ শেতে ত্রিভিস্ত্রিভিঃ

ভাদ্রাদ্যৈর্ব্বমাপার্শ্বেন তস্য ক্রোড়ে শুভং গৃহম্"। [১৭]

ক) পাথরের গড়ঃ- গুজরাট নগরীর পরিকল্পনা প্রসঙ্গে এসেছে 'পাথরের গড়'। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"বীর কত ভাগ্যবান তথা লক্ষ্মী অধিষ্ঠান

চারিদিগে পাথরের গড়"। [১৮]

পণ্ডিতের কক্ষ, আশ্রম চত্বর, হাতিশাল, ঘোড়াশাল কাব্যে বার বার ফিরে ফিরে এসেছে। পাথর নির্মিত দুর্ভেদ্য গড়—

"পাথরে নির্মাণ গড় দ্বারে বান্ধা হাতি-ঘোড়

নিজোজিত চৌদিকে কামান"। [১৯]

বণিকখণ্ডে ইছানি নগরের বর্ণনা যেমন আছে, তেমনি আছে উজানি নগরের বর্ণনা। রম্ভাবতীর কন্যা খুল্লনা। কাব্যে উজানি নগরের বর্ণনা দিয়েছেন কবিকঙ্কণ এরকম—

"উজানির কথা গড় চারিভিতা

চৌদিকে বেউড় বাঁশ

রাজার সামন্ত না পায় অন্ত

যদি ফিরে একমাস

পাথরের গড় উচ্চতর বড়

কাঁঙ্গুরা পুরট-শোভা

পাথর খিচনি জেন দিনমুনি

চৌদিকে মানিক-আভা"। [২০]

মধ্যযুগে পাথরের গড় নির্মাণ স্থাপত্য শিল্পকলার এক আশ্চর্য নিদর্শন। সেকালে নগর পরিকল্পনা করা হত শুভদিন দেখে। শ্রীস্বদেশ রঞ্জন চক্রবর্তী 'প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে শিল্প-প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে লিখেছেন—

"কালকেতু কর্তৃক গুজরাট নগর পত্তনকালেও শিল্পীগণের এই প্রকার শিল্পজ্ঞানের পরিচয় পাইতেছি"। [২১]

কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"চার চৌরি চতুঃশালা মাঝে পিড়া খো ঢালা

পাষাণে রচিত নাছ-বাট্

বিবিধ বিহঙ্গ তথি রূপে যিনি অমরাবতী

পাটশাল পুরট কপাট"। [২২]

গুজরাট নগরের পরিকল্পনায় পাথরের ব্যবহার হয়েছে। সাদা পাথরই পাথর শিল্পের কাঁচামাল। জীবন বাজি রেখে শিল্পীরা পাথর সংগ্রহ করেন। ত্রিপুরা বসু 'রাঢ়ের দুটি লোকশিল্প' (শুশুনিয়ার পাথরশিল্প) প্রবন্ধে লিখেছেন—"কোনরকম খসড়া বা ব্লু প্রিণ্ট ছাড়াই ছেনি, হাতুড়ি ইত্যাদি সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে একখণ্ড অমসৃণ পাথরকে কিভাবে সুন্দর শিল্পদ্রব্যের রূপ দেওয়া হচ্ছে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। দেখতে দেখতে এক কর্কশ পাথরের খণ্ড যেন প্রাণ পায় শিল্পীর প্রতিভার ছোঁয়ায়'।[২৩]

খ) চতুঃশালা:- শালা অর্থাৎ ভবন, গৃহ, আলয়, কক্ষ এবং শিল্পগৃহ। চতুঃশালা অর্থাৎ 'পরস্পরাভিমুখ গৃহচতুষ্টয়'। [২৪]

সেকালে বাড়ির অভ্যন্তরে থাকত চতুঃশালা। কালকেতুর নির্মিত পুরীতে চতুঃশালা ছিল। বেরুনিএঞা অর্থাৎ সাধারণ শ্রমিক শিল্পীরা নির্মাণ করেছিলেন পুরী, সঙ্গে চতুঃশালা। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"পুরীর ভিতরে রচে চারি চতুঃশালা।

মাজ্যা পিড়া খোপনা বান্ধে দিয়া শিলা"। [২৫]

আবার গুজরাট নগরীতে শুভদিনে যে নগরীর ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল, সেখানে পুরীর ভেতরে নির্মিত হয়েছিল চতুঃশালা এবং পাথরে তৈরি নাছ-বাট। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"চারি চৌরি চতুঃশালা মাঝে পিড়া খো ঢালা

পাষাণে রচিত নাছ-বাট

বিবিধ বিহঙ্গ তথি রূপে যিনি অমরাবতী

পাটশাল পুরট কপাট"। [২৬]

শিলায় বাঁধানো পুরীর অভ্যন্তর। প্রস্তর শিল্পীরা সুদূর মধ্যযুগেও পাথর কেটে পাথরের গায়ে শিল্পচিহ্ন এঁকে দিতেন। কিন্তু পাথর শিল্পীদের সেই শিল্প প্রকৌশল আজ বিনষ্টির মুখে। ত্রিপুরা বসু তাঁর 'রাঢ়ের দুটি লোকশিল্প' ('শুশুনিয়ার পাথর শিল্প') প্রবন্ধে লিখেছেন—"একটি শিল্পবস্তু তৈরি করতে যে পরিশ্রম হয়, তার তুলনায় তার দাম বড় কম। তাই দারিদ্র্য যে শিল্পীদের নিত্যসঙ্গী তা দেখলেই বোঝা যায়। সেজন্য সময় সময় শিল্পকাজ ছেড়ে অন্য কোনভাবে জীবিকা অর্জনের চেষ্টাও শিল্পীকে করতে হয়। কেননা অনিশ্চয়তাই এই শিল্পটির প্রধান বৈশিষ্ট্য"। [২৭]

গ) পাটশাল:- গুজরাট নগর পত্তনে পুরীর অভ্যন্তরে পাটশালের নির্মাণ অনেকবার এসেছে। শুধু আখেটিক খণ্ডই নয়, বণিক খণ্ডেও পাটশালের উল্লেখ রয়েছে। সেকালের রাজগৃহে, অভিজাত বাড়িতে পাটশাল থাকত। পাটশাল হল রাজসভা বা বৈঠকখানা। পাটশালা যেমন অপেক্ষাগৃহ তেমনি খেলার ঘর বটে। সেকালে পাশাখেলার প্রচলন ছিল। একসঙ্গে অনেকে পাটশালে বসে পাশা খেলতেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে গুজরাট নগরের যে ভিত্তি পত্তন করা হয়েছিল, সেখানে হনুমান এবং বিশ্বকর্মার রূপ ধরে শ্রমিক-মজুর (বেরুনিয়া) শিল্পীরা নির্মাণ করেছিলেন সৌন্দর্যের অমরাবতী পুরী। সে পুরীতে নির্মিত হয়েছিল পাটশাল। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"বিবিধ বিহঙ্গ তথি রূপে যিনি অমরাবতী

পাটশাল পুরট কপাট।

.....

বামভাগে দুর্গামেলা তার পিছে পাটশালা

সিংহদ্বার পূর্বে জলাশয়"। [২৮]

মধ্যযুগের সাহিত্যে পাটশাল নির্মাণের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। কালকেতুর গুজরাট নগর পরিকল্পনায় নানা সম্প্রদায়ের মানুষ এসেছেন। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী' প্রবন্ধে লিখেছেন—"চণ্ডীর অনুগ্রহে কালকেতু গুজরাট দেশে এক নূতন নগর নির্ম্মাণ করিল। বীরের নগরে অনেক হিন্দু মুসলমান প্রজা আসিয়া জুটিল"। [২৯]

বণিক খণ্ডেও পাটশালের উল্লেখ এসেছে। সাধু ধনপতি অপেক্ষা করছেন পাটশালে। খুল্লনা এলেন, মানব রূপী স্বর্গ অপ্সরা। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"কবরীতে আরোপিল মল্লিকার মালে

হেনকালে আস্যা সাধু বৈসে পাটশালে"। [৩০]

সেকালে পাটশালে পাশাখেলার চল ছিল। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"সখা সনে সাধু পাশা খেলে পাটশালে।

লহনা আসিয়া তার শিরে জল ঢালে"। [৩১]

গুরুগৃহে অপমানিত শ্রীমন্ত। পিতা ছিলেন দীর্ঘ পরবাসে। সুতরাং তার জন্ম পরিচয় নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন স্বয়ং গুরুদেব। লজ্জায় আনত শ্রীমন্ত বলেছেন—

"সকল ছাত্রের মাঝে হেট মাথা কৈনু লাজে

আর না বসিব পাটশালে"। [৩২]

জাত্যাভিমানে অন্ধ উগ্র ব্রাহ্মণ গুরু শিষ্য শ্রীমন্তকে পাটশাল ছেড়ে যেতে বলেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"অবিরোধে চল বেটা পাটশাল ছাড়ি"। [৩৩]

মধ্যযুগের সেই 'পাটশাল' একালে আর নেই। পরবর্তীকালে জমিদারেরা তাদের জমিদারি পরিচালনার জন্য কাছারি বাড়ি তৈরি করেছিলেন। কাছারি বাড়িতে জমিদারে্রা এসে সাময়িকভাবে কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন। কর্মচারী পরিবৃত জমিদার বাড়ি। খাজনা আদায়, বিচারসভা, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ মেটানো প্রভৃতি কাজকর্ম হত সেখানে। লম্বা হলঘর, পুকুর, মাঠ, বাগান, ধান ঝাড়াইয়ের ব্যবস্থা ছিল সেখানে। প্রবালকান্তি হাজরা তাঁর 'গ্রামীণ জীবনরাগের ঝিলিক' গ্রন্থে লিখেছেন—"জমিদারির কাজের সূত্রে এককালে যে কাছারি বাড়িগুলি সব গরম হয়ে থাকতো, তা নানা কারণে উঠে গেছে"। [৩৪]

ঘ) অনাথ মণ্ডপ শালা:- কবিকঙ্কণের কাব্যে এসেছে অনাথ মণ্ডপ অন্নশালা। মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। জমিদার ছিল, জমিদারী শোষণ এবং অত্যাচার ছিল। তা সত্ত্বেও পল্লীতে পল্লীতে এক অনাবিল প্রশস্ত উদারতা বহমান ছিল। একালের কস্‌মোপলিটন সিটির ভয়ানক নরকচিত্র--কুকুরে-মানুষে খাদ্যের জন্য নিরন্তর লড়াই ছিল না। গুজরাট নগরের অভ্যন্তরে যে পুরী নির্মিত হয়েছিল, সেখানে অনাথ আতুরের অন্নসংস্থানের জন্য এক অনন্য স্থাপত্যকলার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তা হল 'অনাথ মণ্ডপ অন্নশালা'। নগর চত্বরের মাঝে শিবের মন্দির সংলগ্ন এমন অন্নশালার উল্লেখ করেছেন কবিকঙ্কণ তাঁর কাব্যে—

"নগর চত্বর মাঝে শিবের মন্দির সাজে

অনাথ মণ্ডপ অন্নশালা"। [৩৫]

বাংলাদেশের শুভ উৎসবের সঙ্গে অনাথ আতুর দরিদ্র মানুষের আত্মীয়তার সম্পর্ক। পূজা-পার্বণ, অন্নপ্রাশন, উপনয়নে, বিবাহে অনাথ-আতুর মানুষকে অন্নদানের ব্যবস্থা করা হত। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'শুভ উৎসব' প্রবন্ধে লিখেছেন—"আমাদের উৎসবে এই অন্তরেরই প্রথম প্রতিষ্ঠা। [.....] উৎসব প্রাঙ্গণ হইতে সামান্য ভিক্ষুক যদি ম্লান মুখে ফিরিয়া যায়, শুভ উৎসব যেন একান্ত ক্ষুণ্ন হয়। [.....] এবং কর্মকার্য্যের সহিত জড়িত হইয়া সকলগুলিই আমাদের শুভকর্ম্ম। দান, ধ্যান সদনুষ্ঠান ও দশ জনের সহিত আত্মীয়তা প্রকাশ ও সকলের আনন্দবর্দ্ধন করাই উদ্দেশ্য"। [৩৬]

ঙ) দোলপিণ্ডি (দোলমঞ্চ): বাংলাদেশের গ্রাম পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়োজনীয় গৃহের সমষ্টিগত রূপ। মূল বাড়ির সংলগ্ন অন্যান্য ছোট ছোট গৃহসজ্জা একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্পের রূপ নেয়। নির্মলকুমার বসু তাঁর 'ভারতের গ্রাম জীবন' গ্রন্থে লিখেছেন – " গ্রামগুলিকে মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। ইহার দুইটি প্রকারভেদ আছে। এক-পিণ্ডাকৃতি, দ্বিতীয়- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহপুঞ্জের সমষ্টি অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্রাকৃতি পিণ্ডের সমষ্টি"। [৩৭]

গুজরাট নগর পত্তনে পুরী নির্মাণের সাথে সাথে কালকেতু 'দোলপিণ্ডি' নির্মাণ করেছেন। দোলপিণ্ডি হল দোলমঞ্চ বা দোল পীড়ি। একে দোল বেদিও বলা হয়। এখানে ঠাকুরের মূর্তি দোলানো হয়। ঠাকুরের এমন পীঠে, ঠাকুর দোলানোর স্থানই দোলপিণ্ডি নামে চিহ্নিত। গুজরাট নগরে দোলপিণ্ডি নির্মাণে বৈষ্ণব অনুষঙ্গ থেকে গেছে। কদম বনের সন্নিধানে এমন দোলমঞ্চ নির্মাণ করেছেন কালকেতু। কদম তলায় ঝুলন বেদীতে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিকে স্মরণ করায় এমন দোলমঞ্চ। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"দিআ হিরা নিলা খণ্ডি নিরমিল দোলপিণ্ডি

কদম্বকানন সন্নিধান"। [৩৮]

ভারতবর্ষের অনেক অংশই বৃন্দাবন ভূমি। শোনা যায়, রাধাকৃষ্ণের ঝুলন গান। দোলপিণ্ডিতে সব হারানো প্রেমিক এমন গান শুনে স্তব্ধ, দৃষ্টিশূন্য হয়ে যান। অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকাহিনী'-র বাপ্পাদিত্য শুনেছিলেন এমন গান। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"হঠাৎ দক্ষিণের হাওয়ায় গানের কথা আরও স্পষ্ট হয়ে বাপ্পার কানের কাছে ভেসে এল, বাপ্পা চমকে উঠে শুনলেন- 'আজ কি আনন্দ! ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ!' এ যে সেই গান! নগেন্দ্রনগরে রাজপুত রাজকুমারীর ঝুলন গান"। [৩৯]

একালে আর সেকালের মত এমন নগর পরিকল্পনা নেই। সেই যুগ পরিবেশের পক্ষেই তা সম্ভব ছিল। একটি হারিয়ে যাওয়া সময়ের স্মৃতিচিহ্নকে বহন করেছে কবিকঙ্কণের কাব্যে উল্লিখিত 'দোলপিণ্ডি'।

চ) মসজিদ:- বাংলাদেশে স্থাপত্য শিল্পকলার বিকাশ হয়েছিল সুলতানী আমলে। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের প্রার্থনা গৃহ এবং কবরস্থানে শীলিত সংস্কৃতির উচ্চ

স্থাপত্যকলা লালিত হয়েছিল। শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর "বাংলাদেশের ইতিহাস : মধ্যযুগ (দ্বিতীয় খন্ড)" গ্রন্থে লিখেছেন—"মধ্যযুগে বাংলার স্থাপত্যশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় মুসলমান সুলতানদের নির্মিত মসজিদ ও সমাধিভবনে। [.....] এগুলি প্রধানত ইষ্টকনির্মিত। ইটের গাথনি মজবুত করার জন্য চুন ব্যবহার করা হইত। তাহা ছাড়া মুঘল যুগে পলস্তারার জন্যও চুন ব্যবহার করা হইত"। [৪০]

কালকেতুর পুরী কেবল হিন্দু-সংস্কৃতির ছাপ বহন করেনি, মুসলমান সংস্কৃতির চিহ্ন বহন করেছে। মন্দিরের পাশাপাশি শত শত মসজিদ নির্মিত হয়েছে। নির্মিত মসজিদের শ্রী এবং সৌন্দর্যের পরিচয়ও দিয়েছেন কবিকঙ্কণ—

"পশ্চিমে যবনালয় তুলিলেন সত্র সত্র

দলিজ মসিদ নানা ছন্দে"। [৪১]

মুসলমানদের প্রার্থনা গৃহ এখনও আছে। কিন্তু গুজরাট নগরীর বিশেষ পরিকল্পনায় স্থানে স্থানে এমন সুনির্মিত স্থাপত্যকলা নেই। একটা বিশেষ যুগ এবং পরিবেশের আধারেই গড়ে উঠেছিল এমন স্থাপত্যকলা। গুজরাট নগরে মুসলমানরা বসতি স্থাপন করেছেন। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী' প্রবন্ধে লিখেছেন "মুকুন্দরাম মুসলমানপাড়ার এক দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনাটি হইয়াছে ভাল। তাহা পড়িতে মজা লাগে। মোটা মোটা মুসলমানী কথায় তাহার মধ্যে যেন একটা হাস্যতরঙ্গ উথলিয়া উঠিয়াছে"। [৪২]

রন্ধনশালা / রসইশাল (পাকশাল) : কবিকঙ্কণের কাব্যে যেমন ব্যঞ্জন-রন্ধনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় আছে, তেমনি রন্ধনশালার উল্লেখ আছে। সেকালে রন্ধনশালার অধিকারী হওয়া নারী জীবনের পরম গৌরবের বিষয় বলেই মনে করা হত। রমণী বহুক্ষেত্রেই রন্ধনশালার একক অধিকারিণী হতে চাইতেন। সপত্নী পরিবৃত সংসারে কুশলী পাকবিদ্যার অধিকারী রমণী মর্যাদা পেতেন। এ নিয়ে সপত্নীদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও শুরু হত।

রন্ধনশালা নির্মাণ এক চমৎকার শিল্পকলা। রতি চতুর্দোলায় চড়ে সতী হয়েছেন। কিন্তু সরস্বতী আকাশ থেকে তাকে দৈববাণী শুনিয়েছেন, আগুন তাঁর শরীর নষ্ট করতে পারে না। কবি লিখেছেন—

"আজি হৈতে নাম তুমি ধর মায়াবতী

রন্ধনের শালে তুমি হবে অধিকারী

তনয়া বলিবে তোরে সম্বরের নারী।

.....

পাবেন সম্বর ভেট রন্ধনের শালে"। [৪৩]

গুজরাট নগর পরিকল্পনা সূত্রে রন্ধনশালার উল্লেখ এসেছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"সুধন্য কৌসলোকালা তুলিল রন্ধনশালা

বিবি চাখে বান্দি যথা রান্ধে"। [৪৪]

বণিক খণ্ডে রন্ধনশালার প্রসঙ্গ এসেছে। ইতিমধ্যে সওদাগর ধনপতি দত্তের সঙ্গে খুল্লনার বিবাহ হয়েছে। অভিমানী লহনাকে প্রিয় বাক্যে সম্বোধন করেছেন ধনপতি। রন্ধনশালায় খুল্লনার রূপ নষ্ট হয়েছে, সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ধনপতি। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"রূপ নাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে

চিন্তমণি নঠ কৈলে কাঁচের বদলে।

.....

অবিরত ঐ চিন্তা অন্য নাঞি গণি

রন্ধনের শালে রূপ নাশিলে পদ্মিনী"। [৪৫]

খুল্লনা রন্ধনপটু। কাব্যের বিভিন্ন স্থানে তার রন্ধনের পরিচয় আছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—"খুল্লনা রসইশালে করুক রন্ধন"। [৪৬]

ধনপতি দত্ত খুল্লনার রন্ধনের প্রশংসা করেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন— "রন্ধনে খুল্লনা আছে রসইর শালে"। [৪৭]

গুরুগৃহে শ্রীমন্ত অপমানিত, লাঞ্ছিত। পিতৃপরিচয় নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছেন গুরু। শ্রীমন্ত বাড়ি ফেরেন না। লহনার জীবন-প্রাণ শ্রীমন্ত। বিব্রত, অস্থির খুল্লনা খুঁজে চলেছেন শ্রীমন্তকে। খুঁজেছেন রন্ধনশালায়—

"ক্ষণেক রন্ধনশালে ক্ষণেক অঙ্গনে

রাজপথ নেহালয়ে অশ্রুলোচনে"। [৪৮]

মধ্যযুগের বাংলাদেশের রন্ধনশালার স্থান নিয়েছে একালের কিচেন। একটা যুগের স্থাপত্য কলাকে পেরিয়ে এসেছি আমরা। পাকশালা সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁর 'মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন— "সমাজের সাধারণ অবস্থা বুঝিতে হইলে ভাবের হিমাদ্রিশিখর হইতে একটু নামিয়া আসিতে হয়। [.....] প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর গ্রন্থই এ বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। [.....] আর থোড় বড়ি মোচার ঘণ্টে তাহার অভিজ্ঞতারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হাটে যাইলে তিনি হাটশুদ্ধ জিনিসের দর জানিয়া আসেন, ঘরে আসিয়া পাকশালায় গিয়া পাচককে রন্ধন সম্বন্ধে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করেন, সংসারের কাজকর্ম্মে অনেক গৃহিণী তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিতে পারেন"। [৪৯]

<u>সূতিকাশাল</u> / <u>আঁতুড়ঘর</u>:- মধ্যযুগের বাংলাদেশের সন্তানসম্ভবা প্রসূতি মায়েদের জন্য পৃথক কক্ষ থাকত। আসন্ন প্রসবা রমণীরা এমন গৃহে বাস করতেন। কবিকঙ্কণের কাব্যের আখেটিক খণ্ডের দেবখণ্ডে এমন গৃহের উল্লেখ আছে। এই গৃহকে বলা হয় সূতিকাশাল। দেবখণ্ডে কৃষ্ণের জন্মকথার বিবরণ প্রসঙ্গে সূতিকাশালের উল্লেখ করেছেন কবি। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"সম্বর পাইয়া নারদের উপদেশ

কৃষ্ণের সূতিকাশালে করিব প্রবেশ"। [৫০]

মধ্যযুগের সেই সূতিকাশাল আজ আর নেই। সেকালের সেই দাইয়েরাও গেছে হারিয়ে। একালের প্রশিক্ষিত ডাক্তারবাবুরা সন্তান প্রসব করান। একটি অবলুপ্ত স্থাপত্যকলাকে ধারণ করে আছে কবিকঙ্কণের কাব্য। প্রবালকান্তি হাজরা তাঁর 'গ্রামীণ জীবনরাগের ঝিলিক' গ্রন্থে লিখেছেন—"বিশ-পঁচিশ বছর আগেও, গ্রামে গ্রামে দু-তিন জন করে দাই-র দেখা পাওয়া যেতো। তারা মেয়েদের সন্তান প্রসবে সাহায্য করতেন। আর আঁতুড় ঘরে প্রসূতি ও নবজাতকের পরিচর্যা করতেন। এরা ধাই নামে অভিহিত। কিন্তু দিন দিন এদের সংখ্যা নগন্য হয়ে হারিয়ে যেতে বসেছে"। [৫১]

ঢেঁকিশাল:- "আয়োজনের মধ্যেও বিশেষ একটু শ্রীছাঁদ আছে। বৈশাখ মাসে কাসন্দীর দিন। দুই দিন পূর্ব্ব হইতে বধূরা আসিয়া ঢেঁকিশালের মেঝ্যা ও সম্মুখের দাওয়াটি বেশ করিয়া নিকাইয়া দিয়া যায় এবং সায়াহ্নে গোয়াল ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিতে আসিয়া গৃহিণী ঢেঁকিশালায়ও ধূপধূনার গন্ধ ছড়াইয়া যান। শুভ দিনে [.....] শুচিবাসে তৎসহ ঢেঁকিশালে প্রবেশ করেন। [.....] ঢেঁকিকে বরণ করিয়া উলুধ্বনি পূর্বক প্রথম পাড় দেওয়া হয়। [.....] পিঠার সময় চাল কোটা, ধান ভানা, এক ঢেঁকিশালেই কত অনুষ্ঠান"। [৫২]

বাঙালির স্থাপত্য শিল্পকলার আর এক নিদর্শন ঢেঁকিশাল। ঢেঁকি হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢেঁকিশালও গেছে হারিয়ে। ভারতীয় দেববাদ, হিন্দু মিথ ঢেঁকিশালের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ঢেঁকিশালকে হিন্দুরা দেবতা স্থান মনে করেন। হিন্দুর শৌচাশৌচ, সংস্কার, রীতি-নীতি প্রভৃতিকে ঢেঁকিশাল ব্যবহারের সময় মান্যতা দেওয়া হয়। মধ্যযুগে নারীকে বহুক্ষেত্রে অবজ্ঞা এবং অবমাননা করা হত। ঢেঁকিশাল শয়নকক্ষ নয়। কিন্তু অবহেলিত নারীকে ঢেঁকিশালে শয়ন করতে হত। মধ্যযুগের বহু নারীকে এমন উপেক্ষা এবং অনাদর সহ্য করতে হয়েছে। সওদাগর ধনপতি দত্তের অবর্তমানে লহনা খুল্লনার প্রতি এমন অন্যায় অত্যাচার নামিয়ে এনেছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"পরিবারে দিহ খুঞ্যা উড়িতে খোসলা।

শয়ন করিতে তারে দিহ ঢেঁকিশালা"। [৫৩]

বণিক খণ্ডে খুল্লনার বারমাস্যার উল্লেখ করেছেন কবিকঙ্কণ। আখেটিক খণ্ডে ফুল্লরার বারমাস্যা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক বণিক খণ্ডে খুল্লনার বারোমাসের সুখ-দুঃখের কাহিনী শুনিয়েছেন কবিকঙ্কণ তাঁর কাব্যে। খুল্লনা বলেছেন—

"শয়ন ঢেকিশালে প্রভু শয়ন ঢেকিশালে

নিদ্রা নাহি হয় খুদ্যা পিপীলিকার জালে"। [৫৪]

কবিকঙ্কণের কাব্যে নারীর অবহেলা, অনাদর, মর্যাদাহানির স্থান রূপেই চিহ্নিত হয়ে আছে ঢেঁকিশালা। আধুনিক সাহিত্যে প্রতীক নির্মাণ ছাড়া আর কোনভাবে কবে লেখকের কলমে কিভাবে ঢেঁকিশাল উঠে আসবে কে জানে?

ঘোড়াশালা / গজশালা: সেকালে রাজা বণিক এবং অভিজাতরা হাতি এবং ঘোড়া পুষতেন। এদের রাখার নির্দিষ্ট স্থান ছিল। মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় হাতি এবং ঘোড়া রাজ প্রভুত্বের প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হত। এছাড়া যুদ্ধ বিগ্রহ, শিকার এবং দুর্গম স্থানে যাতায়াতের জন্য যান হিসাবে হাতি-ঘোড়ার ব্যবহার হত। এর জন্য হাতি ঘোড়াকে প্রশিক্ষিত করে তোলা হত। এদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্থায়ী বাসস্থানের প্রয়োজন হত। এই বাসস্থানই ঘোড়াশালা বা হাতিশালা।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিকখণ্ডে হাতিশাল এবং ঘোড়াশালের উল্লেখ এসেছে। বাণিজ্য ছাড়া সম্পদ হয় না। অর্থাভাবে বণিক গৌরবও অস্তমিত। ধনপতি দত্তের অতীত আভিজাত্যও ধীরে ধীরে বিলীয়মান। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"গজশালে গজ মরে হাত্যারা আঙ্গাম করে

লবঙ্গ নাহিক জায়ফলে

সৈন্ধব বিহনে ঘোড়া শালে মরে জোড়া জোড়া

শঙ্খ নাহি বাজে পূজাকালে"। [৫৫]

শ্রীমন্তকে দেবী সৌভাগ্য দান করেছিলেন। তিনি জলদেবী গজলক্ষ্মী (মনসা)। দেবীর কৃপায় শ্রীমন্ত সিংহলের সাল্বরাজকে পরাজিত করেন। হাহাকার করে ওঠেন রাজা। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"আজি শূন্য হইল মোর হাথি-ঘোড়াশাল।

বান্ধবের শোনিতে বহে নদীখাল"। [৫৬]

সেকালে রাজা রাজড়াদের ঐশ্বর্য ছিল। ছিল হাতিশাল, ঘোড়াশাল। মধ্যযুগের সাহিত্যে যেমন হাতিশাল, ঘোড়াশালের উল্লেখ আছে, তেমনি রূপকথাতেও হাতিশাল ঘোড়াশালের উল্লেখ আছে। রূপকথা পুরোপুরি অবাস্তব নয়। তাতে আছে বাস্তবতার স্পর্শ। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' গ্রন্থের 'কলাবতী রাজকন্যায়' আছে এমন হাতিশাল ঘোড়াশাল। দক্ষিণারঞ্জন লিখেছেন—"রাজার মস্ত বড় কুঠরীভরা মোহর, রাজার সব ছিল"। [৫৭] সময়ের সাথে সাথে হাতিশাল ঘোড়াশালের অস্তিত্ব নেই। এগুলি আজ কেবল স্মৃতি মাত্র।

নাছবাট:- গুজরাট নগর পরিকল্পনায় 'নাছবাট' এর উল্লেখ করেছেন কবিকঙ্কণ। নাছবাট হল 'পথের নিকটস্থ দ্বার' বা 'বহির্দ্বার (Street door)', 'পথ', 'বাহির মহল' বা 'বারবাড়ি'। বাট অর্থাৎ পথ। সংস্কৃত রথ্যা> প্রাকৃত রচ্ছা > বাংলা লচ্ছা> নাছ (নাছ দুয়ার)। গুজরাট নগর পরিকল্পনায় এমন পাথর নির্মিত পথের উল্লেখ আছে। গুজরাট নগর এক পরিপূর্ণ স্থাপত্যকলা। বিচ্ছিন্নভাবে এমন স্থাপত্যের মহিমাকে অনুভব করা যাবে না। কবিকঙ্কণ মুকন্দরাম লিখেছেন—

"চারি চৌরি চতুঃশালা মাঝে পিড়া খো ঢালা

পাষাণে রচিত নাছ-বাট"। [৫৮]

মধ্যযুগের সেই নগর পরিকল্পনা একালের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি চালিত নব উদ্ভাবনে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেছে। আমরা হারিয়ে ফেলেছি একটি বিশেষ যুগের স্থাপত্যকলাকে।

খিড়কি দরজা:- সেকালে খিড়কি দরজা ছিল অন্তঃপুর রমণীদের যাতায়াতের পথ। আর খিড়কি দরজার পাশেই থাকত পুকুর, স্নানের ঘাট। 'আখেটিক খণ্ড'-এ দেবী চণ্ডীর মন্দির নির্মাণেও এমন চমৎকার পরিকল্পনার সন্ধান মেলে। কালকেতু দেবী চণ্ডীর জন্য যে মন্দির নির্মাণ করেছেন, তার পরিকল্পনায় পাওয়া যাচ্ছে—

"অন্তঃপুরে সরোবর করিল নির্মাণ।

পাষাণে বান্ধিল তাঁর ঘাট চারিখান।

উত্তরে খড়কি সিংহদ্বার পূর্বদেশে

পাষাণে রচিত ঘাট সান চারিপাশে"। [৫৯]

একালের আধুনিক ফ্ল্যাটে খিড়কি দরজা নেই। সেই সেকালের একান্নবর্তী পরিবার, বাইরের বৈঠকখানা, মেয়েদের যাতায়াতের রাস্তা, বাঁশবাগান, তুলসীমঞ্চ, শিউলির সুবাস, সন্ধে প্রদীপ চিরকালের মত হারিয়ে ফেলেছি আমরা। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'গৃহকোণ' প্রবন্ধে লিখেছেন—"হে ভামিণী, প্রসন্না হও, তোমার চরণাঙ্গুলি-নখকিরণে যেন আমরা পথের সন্ধান করিয়া লইতে পারি, এবং সেই আলোকেই যেন তোমার মন্দিরের চারু কারুসজ্জা আমাদের চক্ষে উজ্জ্বলবর্ণে প্রতিভাত হয়। [.....] এই বধূ ও মাতৃরূপিণী গৃহিণীর চারু চরণচ্ছটাতেই আমাদের গৃহ উজ্জ্বল"। [৬০]

বাসঘর / বাসরঘর / শয়নঘর :- 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'বণিকখণ্ড' এ বাস ঘরের উল্লেখ এসেছে। বাসঘরকে নানা অলংকরণে অলংকৃত করেন লোকশিল্পীরা। আবার একালের বাসরঘরের অলংকরণে থার্মোকল প্রভৃতি কলে কারখানায় প্রস্তুত উপকরণের প্রভাব যেমন আছে, সেকালে তা ছিল না। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"প্রথম সম্ভাষে [রামা] না বাসিল ডর

হেন বুঝি অই তোমার লব বাসঘর"। [৬১]

এমন খাট চন্দনে সুরভিত শয়নঘরের উল্লেখ কবিকঙ্কণের কাব্যে এসেছে। সওদাগর ধনপতি দত্ত ও খুল্লনার মিলন কক্ষের পরিচয় দিয়েছেন কবিকঙ্কণ—

"সাধুর ইঙ্গিত ধরে প্রবেশিয়া বাসঘরে

খাট করে চন্দনে ভূষিত।

বাসঘরে বিছায় শয়ন

চৌদিকে উচ্ছ্রিত স্থলে মণিময় দীপ জ্বলে

জেন দেখি ইন্দ্রের ভবন"। [৬২]

রমণীর রূপ শয়নকক্ষকে আলোকিত করে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

উহার রূপে তোমার বাসঘর কর্যাছে আল"। [৬৩]

নবদম্পতির প্রণয় সম্ভাষণের একান্ত নিভৃত স্থান বাসঘর বা বাসরঘর। সেকালে শয়ন কক্ষ আয়না, ফুল মালা এবং নানা সুগন্ধীতে ভরপুর থাকত। একালের শয়নকক্ষ বিলেতি প্রসাধনে সজ্জিত থাকে। সেই সেকালের চন্দনের সৌরভ একালের শয়নকক্ষে পাওয়া যাবে না।

তাম্বুঘর (তাঁবু) :- সেকালে বণিক যখন ভিনদেশে বাণিজ্য-প্রয়োজনে যাত্রা করতেন, তখন প্রথম সমুদ্র উপকূলে বা নদীতটে তাঁবু টাঙাতেন। কখনো যুদ্ধের প্রয়োজনে এমন তাঁবু টাঙাতেন বিদেশী বণিক। বাঙালি-পাইক যোদ্ধাকে এমন রণসাজে সিংহল সমুদ্রের তটে দেখা যাচ্ছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"খাটাইয়া তাম্বুঘর বসিল সদাগর

পরিসর নদীর কূলে"। [৬৪]

ভিনদেশী বণিক কিংবা অপরিচিত মানুষকে স্থানীয় মানুষ আশ্রয় দিতে চাইতেন না। তখন অস্থায়ী তাবু তৈরি করে থাকার ব্যবস্থা করতেন। কবিকঙ্কণের কাব্যে ধনপতি দত্ত এমন তাঁবু টাঙিয়েছেন নদীর উপকূলে। সেই প্রাচীন উপকথার মত লোক-লস্কর খাবার দাবার রাখার জায়গা থাকত তাঁবুতে। সওদাগর নৌকা ভিড়াতেন। শিল্পদ্রব্য ও পণ্য নামাতেন। আবার বিদেশীয় শিল্প সম্ভার ভরে নিতেন নৌকাতে। বিপদ সংকুল

সমুদ্র পেরিয়ে উপকূলে নৌকা ভিড়ানোর সেই দিন আজ অতীত। কাব্যে সমৃদ্ধমান অনালোকিত যুগকে বিম্বিত করে গেছেন মুকুন্দরাম।

রাজপ্রাসাদ: পাথরের গড় ও কাঙ্গুরা (চিলে কোঠা) :- উজানি নগরের রাজা বিক্রমকেশরীর রাজপ্রাসাদ এবং গড়ের বর্ণনা দিয়েছেন কবিকঙ্কণ। ইছানি নগরের ধনপতি দত্ত পায়রা ওড়ান। আর উজানি নগরের কন্যা খুল্লনা। পায়রা খুল্লনার আঁচলে পড়ে। কেমন ছিল উজানির রাজপ্রাসাদ। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"পাথরের গড় উচ্চতর বড়

কাঁঙ্গুরা পুরট শোভা"। [৬৫]

এমন পাথরের গড়ে আছে চিলেকোঠা। সৌন্দর্যের বিজয় স্তম্ভ। তা উজ্জ্বল পাথর ও মানিকের আভায় দীপ্যমান। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

পাথর খিচনি জেন দিনমুনি

চৌদিকে মানিক আভা"। [৬৬]

সম্রাট সাজাহান শ্বেত পাথরে নির্মাণ করেছিলেন প্রেমের অমর স্মারক স্তম্ভ তাজমহল। রাজপ্রাসাদও তৈরি হয় পাথরে। পাথর বেঁচে থাকে। পাথর কেটে কেটে শিল্পীরা তৈরি করেছেন মন্দির, মসজিদ - সমগ্র বাংলাদেশ জুড়েই। মুকুন্দরামের কাব্যে রাজপ্রাসাদ, পাথরের গড় এবং চিলে কোঠার উল্লেখ এসেছে। ত্রিপুরা বসু তাঁর 'রাঢ়ের দুটি লোকশিল্প' প্রবন্ধে লিখেছেন – "একখণ্ড অমসৃণ পাথরকে কিভাবে সুন্দর শিল্পদ্রব্যের রূপ দেওয়া হচ্ছে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। দেখতে দেখতে এক কর্কশ পাথরের খণ্ড যেন প্রাণ পায় শিল্পীর প্রতিভার ছোঁয়ায়"।(৬৭)

কামারশাল: খুল্লনার সতীত্ব পরীক্ষার জন্য সেকালের নানা সংস্কারের উল্লেখ করেছেন মুকুন্দরাম। কলসীতে সর্প পরীক্ষা, উত্তপ্ত সাবলের দ্বারা আগুনে পরীক্ষা প্রভৃতি। সাবলকে গরম করার জন্য কামার সম্প্রদায়ের শিল্পী কামারশাল পেতেছেন।
কবিকঙ্কণের কাব্যে কামারশালের উল্লেখ এসেছে এভাবে –

"আজ্ঞা দিল বুহিতাল কামার পাতিল শাল

শাবল হইল হুতাশনে"। [৬৮]

মধ্যযুগের নানা সংস্কার-বিশ্বাস সেকালের স্থাপত্য কলার সঙ্গে যুক্ত থাকত। সেই সংস্কার বিশ্বাস একালে আর নেই। আর সেকালের সেই স্থাপত্য কলাকে একালে এভাবে আর পাওয়া যাবে না।

মহাভারতে গৃহ নির্মাণকারীদের শিল্পী বলা হয়েছে। রাজসূয় যজ্ঞের জন্য যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে স্থাপত্য শিল্পীরা নির্মাণ করেছেন দেবগৃহের মত সৌরভযুক্ত বিশালয়তন গৃহ। মহাভারতকার লিখেছেন –

"ততশ্চক্রুরনুজ্ঞাতাঃ শরণান্যুত শিল্পিনঃ

গন্ধবন্তি বিশালানি বেশ্মানীব দিবৌকসাম্"।[৬৯]

কামারেরা কামারশালে লোহা পুড়িয়ে, পিটিয়ে শিল্পদ্রব্য তৈরি করেন। আগুন-লোহা-হাপর এক কাঠিন্য এনে দেয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম একই কামারশালে বসে বিশ্বকর্মার সন্তানেরা লোহার শিল্প তৈরি করেন। আজো বেঁচে বর্তে আছে কামারশাল। তবে অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে, শিল্পীরা বৃত্তি পরিবর্তন করেছেন। এরকম বৃত্তি পরিবর্তন স্বাভাবিক।

ঋগ্বেদ সংহিতায় লৌহনির্মিত পুরী বা লৌহময় নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। সরস্বতী নদী লৌহনির্মিত পুরীর ন্যায় ধারক। তিনি অন্য সমস্ত জলকে বাধাপ্রদান করেছেন –

"প্র ক্ষোদসা ধায়সা সস্র এষা সরস্বতী ধরুণমায়সী পূঃ।

প্রবাবধানা রথ্যেব যাতি বিশ্বা অপো মহিমা সিংধুরন্যাঃ"। [৭০]

ঋগ্বেদে নদনদী, প্রকৃতি, অরণ্যানী, পৃথিবী, আকাশ-বাতাসের মধ্যে এক প্রাণবস্তু সন্ধান করা যায়। ঋগ্বেদের সময়ে একালের মত জাতিভেদ ছিল না। অবশ্য শূদ্রদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কর্মের কথা বলা হয়েছে। চিকিৎসকের উল্লেখ আছে, কিন্তু লৌহময় পুরী নির্মাণের কারিগর শিল্পী কর্মকারের উল্লেখ নেই –

"কারুরহং ততো ভিষগুপলপ্রক্ষিণী নানা।

নানাধিয়ো বসূযবোহনু গো ইব তস্থি মেং, দ্রায়েং দো পরি স্রব"। [৭১]

পায়রাশাল: বাঙালির জীবন-সংস্কৃতির সঙ্গে এককালে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল পায়রাশাল। সৌখিন, সুখ কাতুরে, গৃহকোণ বিলাসী বাঙালির জীবন পরিচর্যার কুশলী বৈচিত্র্য ছিল সেকালে। পরিবেশ ছিল অনুকূল। এক এক গ্রাম ছিল স্বয়সম্পূর্ণ। সেই সেকালে উঠোন, মাধবীলতা, শিমের ভারা, বকুলতলা, তেঁতুলগাছ, ভিতরবার, গোয়ালঘর, ঢেঁকিশাল, ধানের গোলা, রান্নাশাল, ভুষির মাচা, কলাই-পল ছিল। আর ছিল পায়রাশাল। সৌখিন বাঙালির সৌখিন বিনোদনের চিরন্তন স্মারক পায়রাশাল। সৌখিন সুখ কাতুরে পাখি পায়রা। হারিয়ে যাওয়া বিস্মৃত উপকথার মত বাঙালি সংস্কৃতির একান্ত দৃষ্টি নন্দন শিল্পকলা পায়রা টুঙ বাঙালির জীবন পরিক্রমা থেকে চিরকালের মত হারিয়ে গেছে। পায়রা পালন, পায়রা ওড়ানো সেকালে ছেলেদের একটি বিশেষ শখ ছিল।

পায়রা টুঙ্গ নির্মাণ লোক স্থাপত্যের এক অনন্য উদাহরণ। লোকশিল্পীর নির্মাণ কুশলতার পরিচয় মেলে পায়রাশাল নির্মাণের মধ্য থেকে। পায়রাশাল অনেকটা ধানের গোলার আকৃতির। মাটি দিয়ে সেকালে পায়রাশালের দেওয়াল তৈরি করা হত। এর উপরের চাল খড় দিয়ে ছাওয়া হয়। পায়রাশালের উপরের কারুকার্য দৃষ্টি সুন্দর। গোলাকার পায়রা ঘরের নিচের অংশে প্রকোষ্ঠ থাকে। এই প্রকোষ্ঠগুলি প্রকৃতপক্ষে পায়রার বাসা। গৃহবলিভুক পাখি রূপে পায়রা পরিচিত। ধান, চাল, খুদ, কলাই প্রভৃতি দানা শস্য পায়রার প্রধান খাদ্য। পায়রাশালে পায়রাকে পরিচর্যার জন্য পৃথকভাবে জল এবং খাবার দেওয়ার বন্দোবস্ত থাকে। পায়রাশালের নিচের অংশ প্রশস্ত হয়, যথেষ্ট পরিসর থাকে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় এই ঘর। সর্বোপরি পায়রা শৌখিন পাখি রূপে চিহ্নিত হয়ে এসেছে।

সেকালে গৃহ পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পায়রা ঘর তৈরি করা হত। মূল বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে, বাড়ির সামনে যাওয়ার পথে পায়রা ঘর তৈরি করা হত। মূলবাড়ি,পুকুর, পুকুরঘাট, তুলসীমঞ্চ, গোয়ালঘর, ঢেকিঁশাল এবং পায়রাশাল সমগ্র বাড়ির শোভা সম্ভ্রম ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করত। কিন্তু বাঙালি সেই চিরন্তনী পল্লীর গৃহ

পরিবেশ প্রায় চিরকালের মত হারিয়ে ফেলতে বসেছে। বাঙালির স্থাপত্যকলার অন্যতম গৌরব পায়রাশাল একালে প্রায় গেছে হারিয়ে।

বাংলাসাহিত্যে পায়রাশালের উল্লেখ প্রায় পাওয়া যায় না। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে এরকম পরস্পর সম্পৃক্ত পল্লী পরিবেশ অনুযায়ী স্থাপত্য কলাশিল্পের পরিচয় রয়েছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শ্রীমন্ত বিদ্যালাভ করেছেন। তরুণ বয়স্ক কুমারের অনেক প্রশ্ন। গুরুর কাছে সদর্থক উত্তর প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু গুরু শাস্ত্র অনুসারী উত্তর দিতে অপারগ। গুরু শিষ্য শ্রীমন্তের পিতার অবর্তমানে তাঁর জন্মের প্রসঙ্গ তোলেন। প্রসঙ্গ তোলেন পিতার মৃত্যু সত্ত্বেও মায়ের আমিষ ভোজনের। অপভাষায় অপমান করেন। এমন অপ্রত্যাশিত আঘাতে ব্যথিত শ্রীমন্ত আর ঘরে ফেরেন না। বিচলিত লহনা, খুল্লনা। সখী দুর্বলা ও অন্যান্য সখী খুল্লনার আদেশে শ্রীমন্ত সন্ধানে বেরিয়েছেন। শ্রীমন্ত পায়রাশালায় থাকতে পারেন। পায়রা প্রীতি বালক শ্রীমন্তের স্বভাবসিদ্ধ শখ। এই ভেবে দাসী দুর্বলা পায়রাশালা অনুসন্ধান করতে থাকেন। মুকুন্দ চক্রবর্তী লিখেছেন –

"খুল্লনার আদেশ পাইআ চলিল দুবলা।

আগে নেহালয়ে দাসী পায়রার শালা"। [৭২]

সেকালের আদর্শ গৃহ পরিবেশেই পায়রাশাল তৈরি হত। বালক বালিকারা পায়রা পুষতেন, পায়রা নিয়ে খেলাধূলা করতেন। একালে শিশুদের পায়রা প্রীতি থাকলেও সেই পরিবেশ পরিমণ্ডলে পায়রাশালকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল কাব্যে স্মৃতির স্মারকরূপে বাঙালির স্থাপত্যকলায় পায়রাশাল চিরন্তন হয়ে থাকবে।

জৌঘর (জতু বা গালার তৈরি বাড়ি): জৌঘর বা জতুগৃহ, গালা, গন্ধ মিশ্রিত চর্বি, শন, ধুনা, বাঁশ প্রভৃতি দাহ্য বস্তু ঘি মিশ্রিত করে তৈরি করা হয়। গৃহ নির্মাণে দক্ষ শ্রেষ্ঠ শিল্পীরাই কেবল এমন বাড়ি তৈরি করতে পারেন। মহাভারতকার পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার প্রসঙ্গে দুর্যোধন এবং পাপমতি পুরোচনের জতুগৃহ নির্মাণের কথা উল্লেখ করেছেন। মহাকবি লিখেছেন – "শ্রর্ণসর্জরসং ব্যক্তমানীয় গৃহকম্মণি।

মঞ্জু বল্ব জবংশাদি দ্রবং সর্ব্বং ঘৃতোক্ষিতম।

শিল্পী্ররভিঃ সুকৃতং হ্যাপ্তৈর্বিনীতৈর্বেশ্ম কম্মণ

বিশ্বস্তং মাময়ং পাপো দগ্ধ কামঃ পুরোচন"। (৭৩)

রামায়ণে সীতাদেবীকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল। সীতাদেবী সে পরীক্ষায় সফল হয়েছিলেন। তাতেও সীতার কলঙ্কমোচন হয়নি। পরিণামে তিনি পাতাল প্রবেশ করেছিলেন। কবিকঙ্কণের কাব্যে খুল্লনা লহনার চক্রান্তে বৎসরকাল বনে বনে ছাগল চরিয়েছেন। সমাজপতি-স্বজন ও আত্মীয়রা খুল্লনাকে স্খলিত চরিত্রের নারী বলে মনে করেছেন। তাঁর চরিত্রের বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য খুল্লনাকে অগ্নিপরীক্ষায় বসতে হয়েছিল। সতীত্ব পরীক্ষায় জন্য নির্মিত হয়েছিল জৌগৃহ। মহাভারতেও বারানবতে দুর্যোধন পাণ্ডবদের হত্যা করার জন্য জতুগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। মধ্যযুগের সামাজিক কারাশাসনে নারীর জন্য কোন খোলা আকাশ ছিল না। ছিল মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। ছিল না রৌদ্রকরোজ্জ্বল আলোকচ্ছটা। 'জৌগৃহ' তেমনিই এক সমসময়ের শিল্পকলা, যা মধ্যযুগের রাজন্যবর্গ এবং সমাজপতিদের আগ্রাসী, অমানবিক, ধ্বংসাত্মক সমসময়ের প্রতিরূপ। সতীদাহ প্রথায়ও সুসজ্জিত চিতা রচনা করে নারীকে চিতায় তুলে দেওয়া হত। কবিকঙ্কণের কাব্যে জৌগৃহের উল্লেখ এসেছে নিম্নলিখিত ভাবে –

১) জৌগৃহ (পৃ: ১৮৭), ২) জৌঘর (পৃ: ১৮৮, ২ বার উল্লিখিত), ৩) জৌশালা (পৃ: ১৮৮, ৪ বার উল্লিখিত) ৪) জৌঠগৃহ (পৃ: ১৮৮, ৪ বার উল্লিখিত)।

জৌ বা জউ উন-জতুগৃহ। জতুগৃহ গালা নির্মিত গৃহ। সাধারণ শিল্পীরা 'জৌগৃহ' নির্মাণ করতে পারেন না। মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লিখেছেন –

"জত কারিকর ছিল নগরে নগরে

জৌগৃহ নামে তারা হেট মাথা করে"। (৭৪)

অবশেষে বিশ্বকর্মা হনুমানকে সঙ্গে নিয়ে সাধারণ শিল্পীর রূপ ধরে নির্মাণ করলেন চমৎকার জৌঘর। বিশাই এবং নীলাম্বর দাস দেবতার মানবরূপ। তারা গালা নির্মিত ঘর নির্মাণ করলেন। কেমনভাবে নির্মিত হয়েছিল সেই জৌঘর। মুকুন্দরাম লিখেছেন –

"জৌগৃহ গড়ে তারা হইয়া সাবধান

আনিলেন জত ছিল নগরের নড়ি

সাতানয়্যা বন্দে বিশ্বকর্ম ধরে দড়ি।

সূত্র ধরিয়া ভিত দিল চারিপাট।

জৌ ঝান কাট কৈল কপালি চৌকাট।

জৌ ঝান বাতা কৈল জৌয়ের ছিটনী।

সোল পাট দিয়া কৈল জৌয়ের ছায়নী।

জৌঘর নির্মাইয়া করিল বিদায়

দেখিয়া হরিষ হইল বিপক্ষ সভায়

নীলাম্বর দাস বলে হৈল জৌঘর

সতি হৈলে বাঁচিবে ইহার ভিতর"।[৭৫]

জতুগৃহ নির্মাণ করার জন্য সুতো ধরে ভিত দিয়েছেন শিল্পী। চৌকাঠ, গালার ছিটনী, বাতা এবং পাটের সাহায্যে লোকশিল্পীরা নির্মাণ করেছেন এমন অপরূপ শিল্পকর্ম।

অবশেষে এমন জতুগৃহে অগ্নি সংযোগ করা হল। ষাঁড়ের গর্জনের মত অগ্নির আস্ফালন। উত্তর বাতাসে বহ্নির হনহন শব্দ শোনা যায়। চাল পড়ে, কাঁথ পড়ে। জতুগৃহ পুড়ে যায়। কিন্তু রূপবতী খুল্লনার শঙ্খ তুলসীমালা অবিকৃত থাকে। অগ্নি খুল্লনার শরীরে তুষার শীতল হয়ে যায়। মঙ্গলকাব্যে অলৌকিকতা, দৈবী অনুশাসন এবং poetic justice রক্ষিত হয়েছে। খুল্লনার অপবাদ মুক্তির জন্য এমন জতুগৃহ নির্মিত হয়েছিল। রামায়ণ, মহাভারত এবং মঙ্গলকাব্যে মৃত্যুর একই রকম সরণী লক্ষ করি। একটি যুগের বিশেষ প্রতিবিম্ব হয়ে থেকেছে জতুগৃহ। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও দেবতারূপী ব্রাত্য শিল্পী মানুষই এমন অপরূপ জতুগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। খুল্লনার পরীক্ষার জন্য নির্মিত জতুগৃহ অভিনব শিল্প। শ্রীস্বদেশরঞ্জন চক্রবর্তী 'প্রাচীন বাংলা কাব্যে শিল্প প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে

লিখেছেন – "খুল্লনার জতুগৃহে পরীক্ষাদানের নিমিত্ত, কবিকঙ্কণ জতুগৃহের গঠনপ্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন। [....] যে কারিগর জতুগৃহ নির্মাণে সমর্থ হইবে সে শতপল সোনা পুরস্কার পাইবে"।(৭৬)

মহাভারতে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার জন্য দুর্যোধন বারণাবতে জতুগৃহ নির্মাণ করেছেন-

"তত্র গত্বা চতুঃশালং গৃহংপরমসংবৃতম

আয়ুধাগারমাশ্রিত্য কারমেথা মহাধনম"। (৭৭)

'পাষাণ বান্ধা' ঘাট, দীঘি : কবিকঙ্কণের কাব্যে সরোবর এবং দীঘির উল্লেখ এসেছে। বাস্তু পরিকল্পনায় গৃহসংলগ্ন স্থানে সরোবর এবং কিছু দূরে দীঘি খনন করা হয়ে থাকে। সেকালে দীঘিকে পাথর দিয়ে বাঁধানো হত। আখেটিক খণ্ডে কালকেতু দেবীর চণ্ডীর জন্য পুরী নির্মাণ করেছেন। পুরীর অন্তঃপুরে নির্মাণ করেছেন সরোবর। আর সরোবরের ঘাট বেঁধেছেন পাথরে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"অন্তঃপুরে সরোবর করিল নির্মাণ।

পাষাণে বান্ধিল তাঁর ঘাট চারিখান।।

উত্তরে খড়কি সিংহদ্বার পূর্বদেশে

পাষাণে রচিত ঘাট সান চারি পাশে"। ৭৮

গুজরাট নগরের পরিকল্পনায় দীঘির উল্লেখ এনেছেন কবিকঙ্কণ। দীঘির তটেই মঠ নির্মাণ করা হত। আর তটে প্রতিমা নির্মাণ করে পুজো করা হত। এক পরিপূর্ণ নগর পরিকল্পনার ছবি ধরা পড়েছে কবিকঙ্কণের কাব্যে—

"সুরম্য দীঘি তট তাহাতে বিচিত্র মট

প্রতিমাদি করিল নির্মাণ"। ৭৯

সেকালে দীঘি, সরোবর, পুষ্করিণী, কূপ, তড়াগ প্রতিষ্ঠা করা হত। 'মৎস্য পুরাণে' বলা হয়েছে এগুলি পরিষ্কৃত এবং প্রতিষ্ঠা করলে স্বর্গলাভ ঘটে—

"শৃণু রাজন মহাবাহো তড়াগাদিষু যো বিধিঃ।

পুরাণেষ্বিতিহাসোহয়োং পঠ্যতে বেদবাদিভিঃ।।৪

.....

কূপ-বাপীষু সর্ব্বাসু তথা পুষ্করিণীষু চ।

এষ এব বিধি র্দৃষ্টঃ প্রতিষ্ঠাসু তথৈব চ।।৫১।। [৮০]

দীঘি, পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার সময়ে বেদী প্রস্তুত, মণ্ডপ তৈরি, বৃক্ষরোপন, ব্রাহ্মণভোজন, দান প্রভৃতি পুণ্যকর্ম করা হয়। বণিকখণ্ডেও ঘাটের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে নৌশিল্পের পাশাপাশি ঘাটের গৌরবান্বিত উজ্জ্বল মহিমার ছবি সাহিত্যের পাতায় ফুটে উঠেছে। মনসা মঙ্গল কাব্যে 'নেতাই ধোপানীর ঘাট' তো চিরন্তন শিল্পরূপ। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিকখণ্ডে রত্নমালার ঘাটের উল্লেখ রয়েছে। সওদাগর ধনপতি দত্ত সমুদ্র পেরিয়ে সিংহলদেশে রত্নমালার ঘাটে উঠেছেন। রূপকথায় যেমন তেপান্তরের মাঠ, তিরুপতির ঘাটের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি মঙ্গল কাব্যের পাতায় এমন ঘাটের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে—

"রত্নমালার ঘাটে শুনি দামামার ধ্বনি

পঞ্চপাত্র চমকিত হইল নৃপমুনি।

.....

রত্নমালার ঘাটে শুনি কিসের বাজন"। [৮১]

একালের টিউবওয়েল সেকালের ঘাটের অবশেষ ঘোষণা করেছে। ঘরে ঘরে কল, ঘরে ঘরে জল, সেই সামন্ততান্ত্রিক যুগের পরিবেশ এবং শিল্পকলাকে বিনষ্ট করেছে।

পুকুর / সরোবর: বাংলাদেশে আদর্শ বাস্তুশিল্পের সঙ্গে পুকুর অচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত। পুকুর সাধারণত বাড়ির সংলগ্ন হয়। অনেক বনেদি পরিবারে সদর পুকুরের সঙ্গে খিড়কি পুকুরও থাকে। খিড়কি পুকুরে অন্তঃপুর রমণীরা পেছনের দরজা দিয়ে যাতায়াত

করেন। পুকুর শুধু দৈনন্দিন ব্যবহারিক প্রয়োজনেই ব্যবহার হয় না, গেরস্থের মাঙ্গলিক পূজা-অর্চনা, ঘট স্থাপন প্রভৃতি নানা প্রয়োজনে পুকুর বাঙালির জীবনযাত্রায় মিশে গেছে। সেকালে পুকুরকে উদ্যান দিয়ে ঘিরে রাখা হত। নানা গাছের বেড়া, ফুলের বাগান, পুকুরের শোভা-সৌন্দর্য বৃদ্ধি করত। পুকুর খননের পর পুকুরকে পূজা অর্চনা করে প্রতিষ্ঠা করতেন। সেকালে কন্যাদায় গ্রস্থ পিতা শত দরিদ্র হলেও কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময়ে পাত্রপক্ষের পুকুর আছে কিনা, তা জেনে নিতেন। সকল মাটি কাটা শ্রমিকেরা পুকুর কাটায় সিদ্ধহস্ত নয়। মাটির কাজে অভ্যস্ত কিছু শিল্পী শ্রমিক পুকুর খনন করতেন। নির্দিষ্ট মাপ মেনে, ছাড় ফেলে কোদালিয়ারা পুকুর খনন করতেন। গৃহস্থেরা সময়ে সময়ে পুকুর সংস্কার করতেন। হিন্দুরা পুকুর খনন করা এবং পরিষ্কার করাকে পুণ্য কাজ বলে মনে করতেন। মানুষ তৃষ্ণাভয় থেকে মুক্ত হয়ে স্বর্গলাভের পুণ্য অর্জন করেন। পুকুর সংস্কার এবং পাঁক তুলে ফেলাও পবিত্র কাজ। হিন্দুশাস্ত্রে বিভিন্ন বার তিথির উল্লেখ করে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। 'অথ হিন্দু ব্যবস্থাসর্ব্বস্ব সমগ্র' গ্রন্থে পুষ্করিণীর পরিমান সম্পর্কে বলা হয়েছে, পুষ্করিণীর চারদিকে কুড়ি হস্তের কম এবং চার শত হস্তের বেশি হবে না। এটি পুকুরের পরিমান, তার তীরের পরিমান নয়। "অথ হিন্দু ব্যবস্থাসর্ব্বস্ব সমগ্র" গ্রন্থে উল্লিখিত বশিষ্ঠ সংহিতার একটি শ্লোকে বলা হয়েছে –

"চতুর্ব্বিংশশাঙ্গুলো হস্তো ধনস্তচ্চতুরুত্তরঃ

শত ধন্বন্তরষ্ঞের তাবৎ পুষ্করিণী মতা।

এতৎ পঞ্চাগুণঃ প্রোক্তাস্তড়াগ ইতি নিশ্চয়ঃ"। [৮২]

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খন্ডে কালকেতু দেবী চণ্ডীর জন্য মন্দির নির্মাণ করেছেন। নির্মাণ করেছেন মন্দির সংলগ্ন সরোবর। আর সরোবরের চারধারে উদ্যান তৈরি করেছেন। নানা জাতীয় ফুল-ফলের গাছ লাগিয়েছেন। এক বিশেষ পরিবেশে পুকুরের শোভা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে এমন উদ্যান। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

" শূন্য দেখি সরোবর বীর মহাবল

পাতাল ভেদিয়া তোলে ভোগবতীর জল।

সরোবর বেড়ি বিশাই রচিল উদ্যান

রসাল পনস রম্ভা রূপিল হনুমান।

.....

নেহালি বান্ধুলি চাঁপা টগর তুলসী

রঙ্গন, মালতি জাতি সিঅলি অতসী

সতবর্গ মালতি জুথি কুন্দ কুরুবক

পদ্ম বাকস ঝিটি পারুলি অশোক"। [৮৩]

নির্লোভ ফুল্লরা দেবী চণ্ডীর মাণিক্য অঙ্গুরি পেয়ে উল্লসিত হয় নি। বরং কালকেতুকে অঙ্গুরি নিতে নিষেধ করেছেন। চণ্ডী অবশ্য কালকেতুকে দিয়েছেন সামান্য গার্হস্থ্য দ্রব্য, যথা- শিকা, খণ্ডা, কোদাল প্রভৃতি। আর দিয়েছেন কাটি- অর্থাৎ বাঁশ, লোহা বা কাঠের শলাকা বিশেষ। যা দিয়ে গরম দুধ ঘোরান হয়। যে কাটি শক্ত, যার সঙ্গে পুকুরের পাড়ের তুলনা করেছেন কবিকঙ্কণ – 'চেলা কাটী পেলে জেনে পুখুরের পাড়'।[৮৩ (ক)]

মহাভারতে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের প্রাক্কালে আগত রাজন্যবর্গের বাসগৃহ নির্দিষ্ট করেছিলেন। যে বাসগৃহের নিকটে ছিল দীঘি এবং চমৎকার বৃক্ষ। অতিথি অভ্যর্থনার উপযুক্ত পরিবেশ বাসগৃহ সংলগ্ন দীঘি। যুধিষ্ঠির এমন পরিবেশ-পরিমণ্ডলে আগত রাজন্যবর্গকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। মহাভারতকার লিখেছেন –

"বহুভক্ষ্যান্বিতান্ রাজন্ ! দীর্ঘিকা বৃক্ষশোভিতান্।

তথা ধর্ম্মাত্মজশ্চৈর্যা চক্রে পূজামনুওমাম্।। [৮৪]

পুষ্করিণীর ঘাটের সিঁড়ি বা সোপানকেও হিন্দুশাস্ত্র মতে প্রতিষ্ঠা করা হয়। শুভ মুহূর্তে যজমনে ঘাট প্রতিষ্ঠার সময়ে ঘাটের সিঁড়িতে বসে সংকল্প করেন। 'অথ হিন্দু

ব্যবস্থাসর্ব্বস্ব সমগ্র' গ্রন্থে ঘাট প্রতিষ্ঠার সংকল্প মন্ত্রের উল্লেখ এরকম – "শতবর্ষাবচ্ছিন্ন স্বর্গপ্রাপ্তিকামঃ (শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামে বা) সোপান প্রতিষ্ঠা মহং করিষ্যে- সঙ্কল্প মন্ত্র"। [৮৫]

পাট (ঘরের একদিকের চাল, দেওয়ালের এক ভাগ): কবিকঙ্কণের কাব্যে পাটের উল্লেখ এসেছে। 'পাট' অর্থাৎ দেওয়ালের এক ভাগ। আবার 'পাট' অর্থে ঘরের একদিকের চাল। কালকেতু দেবী চণ্ডীর জন্য মন্দির নির্মাণ করেছেন। নির্মাণ করেছেন মন্দিরের দেওয়াল। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"এমন পাঁচির দিল হইল চারি পাট"। [৮৬]

আবার কালকেতু দেবী চণ্ডীর মন্দিরের এক দিকের চাল তৈরি করেছেন। সেই চাল ছাওয়া হয়েছে খড় দিয়ে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"চারি হালা খড়ে বিশাই ছাইল চারি পাট"। [৮৭]

আবার 'পাট' অর্থে 'শনের থলের' উল্লেখও কবিকঙ্কণের কাব্যে এসেছে। কালকেতু দেবী চণ্ডীর কৃপায় অর্থলাভ করেছেন। তিনি চলেছেন গোলাহাটে। সঙ্গে নিয়েছেন 'পাট' অর্থাৎ 'শনের থলে'। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

'পাইআ টাকার পাট চলে বীর গোলাহাট

পাছু ধায় শতেক কিঙ্কর"। [৮৮]

বাংলাদেশ নিম্ন এবং উর্বর মৃত্তিকার দেশ। বাংলাদেশ পাট শনের দেশ। এই তন্তুজ পণ্য বাংলাদেশের স্মৃতি সত্তায় শত শত বছরের ঐতিহ্য নিয়ে হাজির ছিল। পাটের তৈরি নানা শিল্পদ্রব্য যেমন দড়ি, দোলনা, শিকা, থলে, জালতি, কাছি বিশেষত পাটের কাপড় চিরদিনই বন্দিত হয়ে এসেছে। এমনকি সাধারণ ব্যবহারিক দ্রব্যের সীমানা ছাড়িয়ে যথার্থ শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। পাটের সঙ্গে শনও একই রকম বাংলাদেশের তন্তুজ পণ্য। প্রবালকান্তি হাজরা তাঁর "গ্রামীণ জীবনারাগের ঝিলিক" গ্রন্থে লিখেছেন - "পাট চাষ এবং শন চাষ – বলতে গেলে উঠেই গেছে। এখন দুটি কৃষিপণ্য সহসা আর গ্রামে দেখা যায় না। নানা কারণে এ দুটি কৃষি ফসল নষ্ট বা লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এগুলির অনুষঙ্গে গড়ে ওঠা নানারকম শিল্পেরও বিলুপ্তি ঘটেছে। তাই

তন্তুজ কৃষি পণ্য পাট-শনের ঐতিহ্য, ষাটোর্ধ্ব প্রবীণ মানুষ ছাড়া একালের যুবকদের পক্ষে ধারণা করা শক্ত"। [৮৯] পাট এবং শনের দড়ি ও থলে ঘর গৃহস্থালী এবং স্থাপত্য শিল্পের নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। পাটের তৈরি শিল্পদ্রব্য বাস্তুশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ।

পাথর শিল্প:

বাংলাদেশে পাথরের প্রাচুর্য তেমন বেশি নেই। পাথরের উপকরণও এখানে কম। জল-জঙ্গল কাদামাটির দেশ বাংলাদেশ। তা সত্ত্বেও পাথরের ব্যবহার এবং পাথর শিল্পীদের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে প্রাচীনকাল থেকে। বাংলা সাহিত্যেও অন্যান্য শিল্পের তুলনায় পাথরের শিল্পকর্মের উপস্থিতি কম। পুষ্করিণীকে পাথর দিয়ে বাঁধা, পাথর দিয়ে ঘাট নির্মাণ, পাথর দিয়ে মন্দির বাঁধানো এসব কলাশিল্প বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকে চলে এসেছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খণ্ডে পাথরের ঘাট এবং চণ্ডীর মন্দিরের কলাশিল্প পাথরের সাহায্যে গড়ে তুলেছেন কালকেতু। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"পুরীর ভিতরে রচে চারি চতুঃশালা
মাজ্যা পিড়া খোপনা বান্ধে দিআ শিলা।
অন্তঃপুরে সরোবর করিল নির্মাণ
পাষাণে বান্ধিল তার ঘাট চারিখান।
উত্তরে খড়কি সিংহদ্বার পূর্বদেশে
পাষাণে রচিত ঘাট শান চারি পাশে।
সাতানৈআ রম্ভে বিসাই ধরে সুতা
ইন্দ্রনীল পাষাণে রচিত কৈল পোতা।
সপ্ত মহলে তোলে চণ্ডিকার দেউল

নানা চিত্র লিখে বিশাই হইয়া অনুকূল। [৯০]

ধর্মপ্রাণ বাঙালি নিজের বসত বাড়ি নির্মাণ করেছেন খড়, তালপাতা প্রভৃতি সাধারণ উপকরণ দিয়ে। বাঙালির খড়ো ঘর তো বাংলাদেশের শিল্পকলার আশ্চর্য নমুনা। কিন্তু বাঙালি নিজের প্রাণের দেবতার জন্য পাথরের কারুকার্য খচিত মন্দির তৈরি করেছেন। সেই মন্দির 'সপ্ত মহল' নির্মিত। আর মন্দিরের গায়ে নানা চিত্র অঙ্কন করেছেন। ভক্তিপ্রাণ বাঙালি, দেববাদে বিশ্বাসী বাঙালি মন্দিরের দেওয়ালে পাথর কেটে কেটে নানা পৌরাণিক কাহিনীর চিত্র খোদিত করেছেন। A.L. Basham তাঁর 'The wonder that was India' গ্রন্থের 'The Arts' অধ্যায়ে লিখেছেন – "Nearly all the artistic remains of ancient India are of a religious nature or were at least made for religious purposes. [...] Craftsman were conscious of the symbolism, the temple was looked on by some as a microcosm of the world as the open air sacrifice had been in earlier days. In sculpture, and often in painting also, all the gods were depicted on its walls, every aspect of divine and human existence symbolized". [৯০ (ক)]

মানুষের প্রথম শিল্পকলা পাথরের গাত্রে ফুটে উঠেছিল। আদিম মানুষ ছিলেন শিল্পী। সেই শিল্পকলার উত্তরাধিকার বহন করেছে পরবর্তীকাল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর দেউলে ব্রাত্য অপাংক্তেয় লোকশিল্পী পাথর কেটে নানা চিত্র অঙ্কণ করেছেন। পাথর কেটে দেবীমূর্তি এবং মন্দিরের ভাস্কর্য নির্মাণ করেছেন পাথর শিল্পী।

অনার্য বিবাহে পাথরের পাত্রে আমানি ভরে দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। কালকেতু এবং ফুল্লরার বিবাহে ফুল্লরার পিতা সঞ্জমকেতুর পত্নী নিদয়া পাথরের পাত্রে আমানি ভরে ফুল্লরাকে কোলে করে ক্রন্দন করেছেন-

"পাথরে আমানি ভরি দিল সঞ্জমের নারী

ফুল্লরারে কোলে করি কান্দে"। [৯১]

পাথর কেটে যে শিল্প তৈরি হয় তা চিরন্তন সৌন্দর্য। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় তাঁর 'ভারতশিল্পের কথা' গ্রন্থে লিখেছেন – "শিল্প সৌন্দর্য্যের আরামটুকু

উপভোগ করিতে বেশী কিছু জানাশুনার দরকার হয় না। যাহারা পাহাড় কাটিয়া, এই সকল গুহা রচনা করিয়াছিল, তাহারা শিল্প সৌন্দর্যের নির্দশন রাখিয়া যাইবে বলিয়া রচনা-শ্রম স্বীকার করে নাই। তাহারা আপন প্রয়োজন-সাধনের উদ্দেশ্যে যাহা করিয়াছিল, তাহার ফল সুন্দর হইয়া রহিয়াছে"। [৯২]

চাক / চাকা: চাক গৃহস্থালী শিল্প। পাথরের তৈরি চাকে সামান্য গর্ত করে কাঠি ধরে জোরে জোরে হাত দিয়ে ঘোরানো হয়। চাক ঘোরানোর জন্য কব্জির জোর লাগে। সাধারণত খেসারি কলাই, বিরি কলাই ভেঙে ডাল তৈরি করা হয়। শীতকালে বড়ি দেওয়ার সময় চাকের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রবালকান্তি হাজরা তাঁর 'গ্রামীণ জীবনারাগের ঝিলিক' গ্রন্থে লিখেছেন –

"সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই এসব হারিয়ে যাওয়ার প্রহর গুনছে"। [৯৩]

চাকা আবিষ্কার সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। চাকা মানুষের সভ্যতাকে গতির সঙ্গে যুক্ত করেছে। চাকা নানা উপাদানে তৈরি হতে পারে। পাথর, লোহা, কাঠ দিয়ে চাকা তৈরি হতে পারে। গোরুর গাড়ির চাকা লোহা ও কাঠ দিয়ে তৈরি। চাকা সদৃশ 'পাথরের চাক' কলাই ভাঙার কাজে ব্যবহৃত হয়। আর কুমোরের চাকা মাটির তৈরি জিনিসপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত।

প্রস্তর শিল্প আদিমকাল থেকে চলে এসেছে। আদিম মানুষ ছিলেন শিল্পী। মানুষের প্রথম শিল্পচিহ্নের স্বাক্ষর থেকে গেছে পাথরের গায়ে। আদিম মানুষ পাথর কেটে কেটে গুহার গায়ে প্রথম শিল্পচিহ্ন এঁকে দিয়েছিলেন। স্পেনের আলতামিরা গুহাচিত্র মানুষের প্রথম আবিষ্কৃত শিল্প নমুনা। আদিম মানুষ পাথর দিয়ে হাতিয়ার বানিয়েছে। পাথরের মূর্তি নির্মাণ করেছে, শিল্প সৃষ্টি করেছে। দেব দেবীর শিল্প নির্মাণ তো বটেই, তাজমহল নির্মাণ করেছেন পাথর দিয়ে। পাথর কেটে যে খোল সদৃশ পাথরের চাক তৈরি হয় তা দিয়ে কলাই শস্য ভেঙে ডাল তৈরি হয়।

কবিকঙ্কণের কাব্যে মৃৎশিল্পীদের ব্যবহৃত কুমোরের চাকার উল্লেখ আছে। কুমোর চাকার প্রচণ্ড ঘূর্ণনের গতিকে কাজে লাগিয়ে আঙ্গুলের কৌশলে মৃৎশিল্প তৈরি করেন। বর্তমান গবেষক লক্ষ করেছেন, চাকায় মাটির শিল্প গড়তে গিয়ে কুমোরের হাত ক্ষয়ে গেছে। তালুতে ঘা হয়ে গেছে। কবিকঙ্কণের কাব্যে 'কুমোরের চাক' –এর উল্লেখ এসেছে। চাকাকে কাব্যে প্রয়োগের কৃতিত্ব

অবশ্যই কবিকঙ্কণের। অরণ্যে বীরের বিক্রম এবং ঘোরাফেরাকে কুমোরের চাক ঘোরার সঙ্গে তুলনা করেছেন কবি –

"কপাট-সমান বুক জন-শম ভীম মুখ

কুমোরের চাক জেন ফিরে"। [৯৪]

আবার বণিকখণ্ডে ঝড়ের ঘূর্ণিপাকে ডিঙার পাক খাওয়াকে কবি কুমারের চাকের ঘন ঘুর্ণনের সঙ্গে তুলনা করেছেন -

"ঘুরুণিয়া ঝড়ে ডিঙ্গা ঘন বয় পাক

সেই বায়ে ফিরে যেন কুমারের চাক"।[৯৫]

আবার দুর্গম সিংহলে বসে ধনপতি স্বদেশের পত্র পেয়েছেন। তাঁর মন হয়েছে অস্থির। তাঁর মন যেন কুমারের চাকে আরোহণ করে স্বদেশে পাড়ি দিতে চায়। চাককে নিয়ে চমৎকার কাব্যোৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন কবি। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"না জানি কেমনে পত্র আইল বিপাকে

আরোহণ করে মন কুমারের চাকে"। [৯৬]

যন্ত্র ও প্রযুক্তির প্রসার কুমোর পাড়াকে প্রায় বিলুপ্ত করেছে। ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার যে মৃৎশিল্পীদের সৃজনশীল করে রেখেছিল, তা আর নেই। কুমোরের সেই সমাজ সংহতি আজ আর নেই। বৃত্তি পরিবর্তন প্রায় অবশ্যম্ভাবী তাদের কাছে। মধ্যযুগে কুমোরের চাক যে সাহিত্য রূপের সৃষ্টি করেছিল, সেই সৃষ্টি সম্ভাবনা একালে আর প্রায় থাকছে না। কুমোরেরা চাকা তৈরি করেন। নীহার ঘোষ তাঁর " বাংলার প্রাচীন মৃত্তিকা ভাস্কর্য" গ্রন্থে লিখেছেন – "মাটি পোড়ানোর কারিগরী পদ্ধতি এখানকার মানুষের অধিগত ছিল এবং কুমারের 'চাকা' খ্রিষ্টপূর্বাব্দ দ্বিতীয় সহস্রাব্দে এখানে ব্যবহৃত হয়ে থাকবে বাণিজ্যিক উৎপাদনের স্বার্থে। এসব কারিগরী উদ্ভাবন মানুষের সামনে নতুন দিগন্ত মেলে ধরেছে – যা পরবর্তীকালে এই শিল্প মাধ্যমটিকে মর্যাদার শিখরে উন্নীত করেছে"। [৯৭]

বাংলার গ্রামজীবনে শীলিত সামঞ্জস্য এবং পরিপাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মধ্যযুগের বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর ছিল। নিম্ন এবং উর্বরা

জলাভূমি, নদীমাতৃক বাংলাদেশ, গাছ-গাছালি, লতা পাতার বিপুল সমাহার বাংলাদেশের পল্লীকে রূপসী বাংলায় রূপান্তরিত করেছে। বাঙালি শিল্পীরা কুটির তৈরি করেছেন। তালপাতা ও খড়ের ছাওয়া ঘর তৈরি করেছেন। বাঁশের বেড়া দিয়ে মাটির বাড়ি তৈরি করেছেন। দেবপূজার জন্য মন্দির নির্মাণ করেছেন। বাঙালির স্থাপত্য শিল্পে ভারতীয় পুরাণ বিশেষভাবে জায়গা নিয়েছে। নানা দেব দেবীর মূর্তি এবং প্রতীক সম্বলিত চিত্র মন্দির গাত্রে অঙ্কন করেছেন। বাড়ির দেওয়ালে আলপনা দিয়েছেন পল্লী রমণীরা। পুকুরের ঘাট নির্মাণ, দীঘি সংস্কার, রন্ধনশালা তৈরি, ঢেঁকিশাল, হাতিশাল, ঘোড়াশাল, চিলেকোঠা তৈরি করেছেন বাঙালি স্থপতিরা। এছাড়া বৈঠকখানা বা পাটশাল তৈরি করেছেন। A.L. Basham তাঁর "The Wonder that was India" গ্রন্থে লিখেছেন - "The medieval period in India was, like the Middle Ages in Europe, an age of faith. With better techniques of stone construction new temples sprang up everywhere to replace earlier wooden or brick buildings, and kings and chiefs vied with one another in their foundation" [৯৮]

মধ্যযুগের বাঙালি স্থপতিরা গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে বাস্তুশাস্ত্রের সাহায্য নিয়েছেন। সর্বোপরি এরপর হিন্দু গৃহস্থ দেব প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'অথ হিন্দু ব্যবস্থা সর্ব্বস্ব সমগ্র' গ্রন্থে গৃহারম্ভ ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে বাস্তু জমির শেষদিকে, কোণে এবং মধ্যে গৃহনির্মাণের নিষেধ আছে। বাস্তুজমির কোণে গৃহনির্মাণ ধনহানি ঘটায়, মধ্যে সর্বনাশ ঘটায় এবং শেষে শত্রুভয় উপস্থিত করে। সুতরাং হিন্দু ব্যবস্থা শাস্ত্রে ঐ স্থান ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে-

" ন কোণেষু গৃহং কুযাৎ নাপ্যন্তে নাপি মধ্যতঃ

কোণে চ ধনহানি স্যাদন্তে বিপুভয়ং ভবেৎ

মধ্যে চ সর্ব্বনাশঃ স্যাওস্মাদেতদ্ বিবর্জ্জয়েৎ"। [৯৯]

বাংলার চণ্ডীমণ্ডপের সঙ্গে কালকেতুর স্মৃতি যেন অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত হয়ে গেছে। কালকেতু দেবী চণ্ডীর দেউল তৈরি করেছিলেন। একটা যুগের নির্মাণের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে কাব্যে। সংহত গ্রাম সমাজের প্রতীকরূপ

নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। চণ্ডীমণ্ডপ বিনষ্টির স্মৃতি সহৃদয় মানুষকে আবেগ বিহ্বল করে তোলে। চণ্ডীমণ্ডপ লোক উৎসবের প্রতীকরূপ, লোক সাধারণের সভাগৃহ, লোক বিচারের কেন্দ্রস্থল, লোকগীতি এবং মঙ্গলগানের সুদীর্ঘ ইতিহাস ধারণ করে আছে। বাংলার স্থাপত্য শিল্প প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)' গ্রন্থে লিখেছেন – "খুঁটি ও খড়ের তৈরি ধনুকাকৃতি দোচালা, চৌচালা বা আটচালা ঘরে, নানা বাঁশ ও বেতের শিল্পে এবং আরো নানা প্রকারের গৃহকলায় সেই প্রাচীন লোকায়ত শিল্পের ধারাই বহমান। [...] সাধারণ লোকের বসবাসের জন্য ঘরবাড়ি যাহা নির্মাণ করিত তাহা সাধারণত, বাঁশ, কাঠ, নল-ঘাগড়া, খড়, পাতা প্রভৃতির সাহায্যে। কাল জয় করিবার মত শক্তি ইহাদের ছিল না। [.....] তবে রাজা-রাজড়া এবং সমাজের সমৃদ্ধ শ্রেণীর লোকেরা যে সব দেবমন্দির, বিহার ইত্যাদি নির্মাণ করাইতেন সেগুলিতে প্রধানত ইট এবং খুব স্বল্প পরিমানে পাথর – যেমন দরজায়, জানালায়, খিলানে, সিঁড়িতে, কোণে কোণে ব্যবহৃত হইত"। [১০০]

নানা রঙে-রেখায়-আলপনায় দেবমন্দির এবং ঘর গৃহস্থালীকে প্রতীকায়িত করা হত। এই প্রতীকরূপের মধ্যে ভারতীয় কলাশিল্পের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে, তা হল পুরাণ প্রবণতা। স্ট্রেলা ক্রামরিস তাঁর 'The Art of India' গ্রন্থে এই পুরাণ মুখিনতার প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি ভারতীয় চিত্রকলায় যাদুর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন - "In this art, the shape of man and all subsidiary figures are ordered is accordance with a living myth. […] The craftsman, his patron and the public for whom he makes the work of art are, magically one, and his relationship is further supported by the fact that the craftsman is a link in the unbroken chain of the Tradition." [১০১]

স্থাপত্য শিল্প : প্রয়োজন – সৌন্দর্য –মোটিফ-অলংকরণ

লোকজ স্থাপত্য বাংলার নিজস্ব সম্পদ। বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ, বাঙালির মানস-স্বাস্থ্য, সমাজ-ধর্মবোধ, সর্বোপরি প্রয়োজন বাংলার স্থাপত্য শিল্পকে অনন্য করে তুলেছে। প্রাকৃতিক উপাদান বিশেষত মাটি, বনজ

ও প্রাকৃতজ সম্পদে ভরপুর আমাদের রূপসী বাংলা। ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার স্থাপত্য শিল্পীকে জন্মসূত্রেই শিল্পী হতে সাহায্য করেছে। রৌদ্র-করোজ্জ্বল বাংলাদেশ, বৃষ্টি-বিধৌত বাংলাদেশ, পলিমাটি-কাদামাটির দেশ, এই বাংলায় বাঁশ-কাঠ-খড় পাতার অভাব নেই। আদর্শ গ্রাম এবং পল্লী পরিবেশে স্থাপত্য শিল্পীরা প্রয়োজন অনুসারী ঘর-বাড়ী নির্মাণ করেছেন। মাটির বাড়ি, খড়ের বাড়ি, তালপাতার ছাউনি বাড়ি, মণ্ডপ, মন্দির, মসজিদ, রান্নাঘর, গোয়ালঘর, ঢেঁকিশাল, পুজোর ঘর নির্মাণ করেছেন। হিন্দুর লোকায়ত বিশ্বাস এবং ধর্মবোধ স্থাপত্য শিল্পকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। বাস্তু শাস্ত্র এবং জ্যোতিষ বাংলার স্থাপত্য কলাকে বিন্যস্ত করেছে। বিশেষত হিন্দু পুরাণ অনুসারী শিল্পমূর্তি বাঙালির গৃহকোণকে অপরূপ করে তুলেছে। একথা ঠিক, প্রয়োজন অনুসারী গৃহনির্মাণই হল বাংলার বাস্তুশিল্পের মৌলিক অনুসন্ধান।

বাংলাদেশের মাটির ঘর, খড় বা তালপাতার কুঁড়ে, টালির ঘর, পায়রা টুঙ্গ বা ধানের গোলা যাই হোক না কেন, বৃষ্টি গড়িয়ে পড়ার মত ঢালু চাল তৈরি করা হয়, যা বৃষ্টির জলকে বাড়ির মূল স্থাপত্য থেকে অনেকখানি দূরে গিয়ে ফেলে। কিছুটা পিরামিডের মত আকৃতির বাড়ি। হোগলা, তালপাতা, খেঁজুর পাতা খড়ের ছাওয়া বাড়ি। আর খুটির জন্য কাঠ, বাঁশ, বেত, দাঁড় করিয়ে বাড়ি মজবুত করা হয়। একচালা, দোচালা, চারচালা এমনকি আটচালা পর্যন্ত এরকম বাসযোগ্য বাড়ি নির্মাণ করা হয়।

প্রশ্ন থাকে, কুঁড়ে ঘরের আবার সৌন্দর্য কি? কুঁড়ে ঘরের সৌন্দর্য ভুবন বিদিত। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থে লিখেছেন – "বঙ্গদেশের স্বাভাবিক শিল্পানুরাগ খড়ো ঘরেই যথাসাধ্য প্রযুক্ত হইয়াছিল। [.....] মাটির ঘরের এরূপ রূপ লাবণ্য এবং সমস্ত পল্লীর এরূপ অপরূপ সৌন্দর্য ধারণা করা যায় না। [.....] আমি আমাদের দেশের মঠ মন্দিরের কয়েকখানি প্রতিচিত্র দিব। উহাতে অতি পুরাকাল হইতে বাঙ্গালী-স্থাপত্যের বিশেষত্ব কতকটা দৃষ্ট হইবে"।[১০২]

বাংলাদেশের মাটির ঘরের দেওয়াল প্রস্তুতকারী শিল্পীদের বলা হয় ‘কেঁথুয়া”। কাঁথ দিয়ে বাড়ি তৈরি করেন শিল্পীরা। ধান কাটার পর মেঠো জমিতে জল দিয়ে জাব তৈরি করেন। কোদালিয়া কোদাল দিয়ে কাঁচামাটি বিশেষ পদ্ধতিতে কেটে কেঁথুয়ার কাছে পাঠান। কেঁথুয়া একতলা, দোতলা মাটির বাড়ি তৈরি করেন। মাটির বাড়ি তৈরির সময় সৌন্দর্য-সামঞ্জস্য ও অলংকরণের প্রতি লক্ষ্য রাখেন শিল্পী। গৃহশিল্পী গৃহকে মার্জিত করেন, অলংকৃত করেন, পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করেন। সৌন্দর্য কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন শিল্পী। সর্বোপরি সংহত সমাজে সেই শিল্প অপরূপ হয়ে ওঠে। মাটির দেওয়াল এবং তালপাতার ছাউনির এমন কুটীরকে অলংকৃত করেন লোকশিল্পী। গুরুসদয় দত্ত তাঁর ‘বাংলার লোকশিল্প ও লোকনৃত্য’ গ্রন্থে ‘পশ্চিম বাংলার মেয়েদের প্রাচীর চিত্রশিল্প’ প্রবন্ধে লিখেছেন – “আধভাঙা খড়ের চালওয়ালা কুটীর নজরে পড়লো।[....] কারণ কুটীরের মাটির দেয়ালে উজ্জ্বল নীল, হলদে, সাদা ও সবুজ রঙ্গে আঁকা দুটি পদ্মফুল- এই দুটি পদ্ম রেখা ও রঙ্গের অসাধারণ সৌন্দর্য্যের সমাবেশের সম্পদে কুটীরটিকে এমনই একটি গৌরবময় রূপ দিয়েছিল যে কুটিরটিকে লক্ষ না করে থাকা অসম্ভব ছিল। কুটিরের দরজার দুই পাশে খড়ের চালের অল্প নীচে এই পদ্ম আঁকা ছিল। [...] এই পদ্মটির সৌন্দর্য্য যেন চুম্বক পাথরের মত আকর্ষণ করে সেই কুটীরের দোরে নিয়ে গেল”। [১০৩]

গুরুসদয় দত্ত তাঁর অভিজ্ঞতায় আর একটি বাড়ির নমুনা দিয়েছেন এভাবে – “বাড়ীটাকে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত নানাপ্রকার রঙ্গীন পরিকল্পনার চিত্রে একটা অলকাপুরী করে রেখেছেন। মাটির দেয়াল, কাঠের দোর, ধানের মরাই কোনটাই বাদ যায় নি, ঢেউখেলান জলের পরিকল্পনা, পদ্মের ও লতার পরিকল্পনা, মকরের মুখের পরিকল্পনা ইত্যাদি নানা প্রকার পরিকল্পনার মৌলিকতাময় চিত্রে সমস্ত বাড়ীটি ভরা”। [১০৪]

এই শিল্পীদের অনেকেই মহিলা শিল্পী। একান্তই লেখা-পড়া না জানা গ্রাম্য মহিলারা ঘরে ঘরেই শিল্পী হয়ে উঠেছেন। তাদের হাতের কাজ এবং

চিত্রকলায় আছে নির্মল সহজ সৌন্দর্য। পুরুষানুক্রমে, বংশ পরম্পরায় ঐতিহ্যসূত্রে শিল্পীরা এসব অলংকরণ আয়ত্ত করেছেন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত স্থাপত্য শিল্প একটি চিত্ররূপশালা। গুজরাট নগর পরিকল্পনায় এক আশ্চর্য সুসামঞ্জস্য রয়েছে। পাথরের গড়, চতুঃশালা, খিড়কি দরজা, বৈঠকখানা, অনাথ মণ্ডপ শালা, দোলমঞ্চ এগুলি মধ্যযুগের গ্রাম্য পরিবেশে সৌন্দর্যের দীপ্তি নিয়ে উপস্থিত। আবার বণিকখণ্ডে রন্ধনশালা, ঢেঁকিশালা, ঘোড়াশালা, হাতিশালা, নাছবাট, বাসরঘর, তাম্বুঘর, চিলেকোঠা, পায়রাশাল এবং জৌঘর সেকালের অভিজাত বণিক সম্প্রদায়ের পরিশীলিত সংস্কৃতির চিহ্ন বহন করে। সর্বোপরি প্রাচীর, পুকুর এবং পাথরের শিল্প কাজের অলংকরণ স্থাপত্য শিল্পের শোভা-শুভ্রতা ও দীপ্তি এনেছে। মধ্যযুগের দৈবী আচ্ছন্ন বাংলাদেশে প্রতীক-মোটিফে শুভাশুভবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত হয়েছে এসব কল্যাণমুখী ভাবনাকে মাথায় রেখে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেওয়াল চিত্রে অঙ্কিত আলপনায়ও পুরাণভাবনা ফুটে উঠেছে।

জীবনের সর্বক্ষেত্রেই মানুষের শিল্প চেতনার প্রকাশ আছে। সৌন্দর্যের মূলেই শিল্প। Yuri Borev তাঁর 'Aesthetics' গ্রন্থে লিখেছেন - "Art is the heart of aesthetic activity.[…] Aesthetic activity can be practical (Landscape gardening, industrial design) or artistic (creation of work of art) as well as spiritual-culture, emotional and intellectual when it shapes aesthetic impressions, notions, tastes and ideals, and theoretical when it generates aesthetic doctrines and views." [১০৫]

তথ্যসূত্র

১. মজুমদার, শ্রীরমেশচন্দ্র (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস: মধ্যযুগ (দ্বিতীয় খণ্ড), জেনারেল প্রিন্টার্স আন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৮৫, পৃ: ৪৩১ – ৪৩২

২. পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৪৭

৩. ঘোষ, বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ফেব্রুয়ারী – ১৯৮৯, পৃ: ৭১

৪. পূর্বোক্ত, পৃ: ৭২

৫. চক্রবর্তী, শ্রীস্বদেশরঞ্জন, প্রাচীন বাংলা কাব্যে শিল্প প্রসঙ্গ, বঙ্গশ্রী (পত্রিকা), ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৭, পৃ: ৩৭০, সম্পাদক –সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য

৬. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ৭১

৭. পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৭

৮. পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৭

৯. ভট্টাচার্য, শ্রীশ্যামাচরণ (সংকলিত), অথ হিন্দু ব্যবস্থাসর্ব্বস্ব সমগ্র, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০১৯, পৃ: ২৪

১০. ব্যসদেব, মহাভারতম্: সভাপর্ব্ব, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদক), বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় বিশ্ববাণী সংস্করণ: জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ: ২৯২

১১. ঘোষ, বিনয়, বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব:('বাংলার চণ্ডীমণ্ডপ' অংশ), অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪০৬, পৃ: ১২৫, ১৩৬

১২. দত্ত, গুরুসদয়, বাংলার লোকশিল্প ও লোকনৃত্য, ছাতিম বুকস, কলকাতা, মে ২০০৮, পৃ: ১৮৮

১৩. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ৭১

১৪. দত্ত, গুরুসদয়, বাংলার মেয়েদের আলপনা ও প্রাচীর চিত্র, সংকলন ও সম্পাদনা – বারিদবরণ ঘোষ, পুনশ্চ, কলকাতা -৯, বইমেলা – ২০০৮, পৃ: ৩৭৮-৩৭৯

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৭৯

১৬. ব্যসদেব, মহাভারতম্: সভাপর্ব্ব, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদক), বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় বিশ্ববাণী সংস্করণ: জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ: ২৯২

১৭. ভট্টাচার্য , শ্রীশ্যামাচরণ (সংকলিত), অথ হিন্দু ব্যবস্থাসর্ব্বস্ব সমগ্র, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০১৯, পৃ: ১৪৩

১৮. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ৮৬

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৮

২০. পূর্বোক্ত, পৃ: ১১৩

২১. চক্রবর্তী, শ্রীস্বদেশরঞ্জন, প্রাচীন বাংলা কাব্যে শিল্প প্রসঙ্গ, বঙ্গশ্রী (পত্রিকা), ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৭, পৃ: ৩৭২, সম্পাদক –সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য

২২. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ৭২

২৩. লোকশ্রুতি/১৩ (পত্রিকা), সুধীপ্রধান ও অন্যান্য (সম্পাদক মণ্ডলী), লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথা ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ত্রয়োদশ সংখ্যা, জুলাই ১৯৯৭, রাঢ়ের দুটি লোকশিল্প: ত্রিপুরা বসু, পৃ: ১৫১

২৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, বঙ্গীয় শব্দকোষ (প্রথম খণ্ড), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০০৪, পৃ: ৮৫৫

২৫. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ৭১

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ: ৭২

২৭. লোকশ্রুতি/১৩ (পত্রিকা), সুধীপ্রধান ও অন্যান্য (সম্পাদক মণ্ডলী), লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথা ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ত্রয়োদশ সংখ্যা, জুলাই ১৯৯৭, রাঢ়ের দুটি লোকশিল্প: ত্রিপুরা বসু, পৃ: ১৫২

২৮. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ৭২

২৯. ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (প্রবন্ধ), বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, সম্পাদক – ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয়- সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, মাঘ – ১৮২২, পৃ: ১৪৯

৩০. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ১৫৪

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭২

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ: ২২৭

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ: ২২৪

৩৪. হাজরা, প্রবালকান্তি, গ্রামীণ জীবনারাগের ঝিলিক, প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা , ১৪১৮, পৃ: ১৭৮

৩৫. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ৭২

৩৬. ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ, শুভ উৎসব, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয়- সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৪২২, পৃ: ৪২২ – ৪২৩

৩৭. বসু, নির্মলকুমার, ভারতের গ্রাম জীবন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ২০১৭, পৃ: ১৫

৩৮. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ৭২

৩৯. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, বাপ্পাদিত্য (রাজকাহিনী), অবনীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৪২০, পৃ: ৮১

৪০. মজুমদার, শ্রীরমেশচন্দ্র (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস: মধ্যযুগ (দ্বিতীয় খণ্ড), জেনারেল প্রিন্টার্স আন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৮৫, পৃ: ৪৩১

৪১. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ৭১

৪২. ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (প্রবন্ধ), বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয়- সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৪২২, পৃ: ১৪৯

৪৩. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ১৭-১৮

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ: ৭২

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ১১৯

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫৭

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬২

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ: ২২৫

৪৯. ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (প্রবন্ধ), বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয়- সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৪২২, পৃ: ১৪৭

৫০. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ১৮

৫১. হাজরা, প্রবালকান্তি, গ্রামীণ জীবনারাগের ঝিলিক, প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৮, পৃ: ৮৬

৫২. ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ, নিমন্ত্রণ সভা, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, সম্পাদক – ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয়- সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা , মাঘ – ১৪২২, পৃ: ৪৩২

৫৩. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি,, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ১৩৭

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬৮

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯২

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৭৬

৫৭. মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, কলাবতী রাজকন্যা, ঠাকুরমার ঝুলি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪১০, পৃ: - ২৯

৫৮. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি,, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ৭২

৫৯. পূর্বোক্ত, পৃ: ৭১

৬০. ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, সম্পাদক – ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয়- সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, মাঘ – ১৪২২, পৃ: ১৪৭

৬১. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি,, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ১৫৫

৬২. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬১

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬৯

৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ: ২০৮

৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ১১৩

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ: ১১৩

৬৭. লোকশ্রুতি/১৩ (পত্রিকা), সুধীপ্রধান ও অন্যান্য (সম্পাদক মণ্ডলী), লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথা ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ত্রয়োদশ সংখ্যা, জুলাই ১৯৯৭, রাঢ়ের দুটি লোকশিল্প: ত্রিপুরা বসু, পৃ: ১৫১

৬৮. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ১৮৫

৬৯. ব্যাসদেব, মহাভারতম্: সভাপর্ব্ব (৫), হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদক), বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় বিশ্ববাণী সংস্করণ: জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ: ২৮৫

৭০. দত্ত, রমেশচন্দ্র সংকলিত, নিমাই চন্দ্র পাল (সম্পাদিত), ঋগ্বেদ সংহিতা (মূল), ৭ মণ্ডল, ৯৫ সূক্ত, ।।১।। সদেশ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ: ৪৪৫

৭১. পূর্বোক্ত, ৯ মণ্ডল, ১১২ সূক্ত ।। ৩।। পৃ: ৬২৩

৭২. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ২২৫

৭৩. ব্যাসদেব, মহাভারতম্: আদিপর্ব্ব (৩), হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদক), বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় বিশ্ববাণী সংস্করণ: জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১৫৩৯

৭৪. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ১৮৬

৭৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮৭

৭৬. চক্রবর্তী, শ্রীস্বদেশরঞ্জন, প্রাচীন বাংলা কাব্যে শিল্প প্রসঙ্গ, বঙ্গশ্রী (পত্রিকা), ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৭, পৃ: ৩৭২, সম্পাদক –সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য

৭৭. ব্যাসদেব, মহাভারতম্: সভাপর্ব্ব (৫), হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদক), বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় বিশ্ববাণী সংস্করণ: জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১৫২৩

৭৮. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ৭১

৭৯. পূর্বোক্ত, পৃ: ৭২

৮০. তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পাদক), মৎস্য পুরাণ, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ: ২০৩, ২০৬

৮১. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ২৫৩

৮২. ভট্টাচার্য, শ্রীশ্যামাচরণ (সংকলিত), অথ হিন্দু ব্যবস্থাসর্ব্বস্ব সমগ্র, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ: ২৪

৮৩. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ২৯

৮৩ (ক). পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৪

৮৪. ব্যাসদেব, মহাভারতমঃ সভাপর্ব্ব (৫), সম্পাদক - হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদক), বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় বিশ্ববাণী সংস্করণ: জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ: ২৯২

৮৫. ভট্টাচার্য, শ্রীশ্যামাচরণ (সংকলিত), অথ হিন্দুব্যবস্থা সর্ব্বস্ব সমগ্র, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ: ২৭

৮৬. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ২৫৩

৮৭. পূর্বোক্ত, পৃ: ৭১

৮৮. পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৭

৮৯. হাজরা, প্রবালকান্তি, গ্রামীণ জীবন রাগের ঝিলিক, প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা, এপ্রিল -২০১১,পৃ: ১৫৩

৯০. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ৭১

৯০ (ক). Basham, A.L. , The wonder that was India, Picador, London, PP. 349, 366

৯১. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি,, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ৪৪

৯২. মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার, ভারত শিল্পের কথা, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৩৮৯,

পৃ: ১২-১৩

৯৩. হাজরা , প্রবালকান্ত, গ্রামীণ জীবন রাগের ঝিলিক, প্রভা প্রকাশনী,কলকাতা, এপ্রিল -২০১১, পৃ: ২১৩

৯৪. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ – ২০১৩, পৃ: ৬৮

৯৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ২০৪

৯৬. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৮৮

৯৭. ঘোষ, নীহার, বাংলার প্রাচীন মৃত্তিকা ভাস্কর্য, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, মে- ২০০০, পৃ: ৭,

৯৮. Basham A.L, The Wonder that was India, Picador, London, 2004, P. 358

৯৯. ভট্টাচার্য, শ্রীশ্যামাচরণ (সংকলিত), অথ হিন্দু ব্যবস্থাসর্ব্বস্ব সমগ্র, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০১৯, পৃ: ৩০

১০০. রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আশ্বিন – ১৪০২, পৃ: ৬৩৪-৬৩৫

১০১. Kramrish , Stella, The Art of India, The Phaidon Press, 5 eromwell place, London, SW 7, 1965, PP. 10,12

১০২. সেন, দীনেশচন্দ্র, বৃহৎ বঙ্গ (প্রথম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মার্চ – ২০০৬ পৃ: ৫৫৮, ৫৬৫, পৃ: ৫৬৭

১০৩. দত্ত, গুরুসদয়, বাংলার লোকশিল্প ও লোকনৃত্য, ছাতিম বুকস, কলকাতা, মে ২০০৮ পৃ: ১৯০

১০৪. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯২

১০৫. Borev, Yuri, Aesthetics, Progress Publishers, Moscow, 1985, PP. 26 -27